বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

একাদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা □ মার্চ-এপ্রিল 1988 □ দু' টাকা

"লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার"

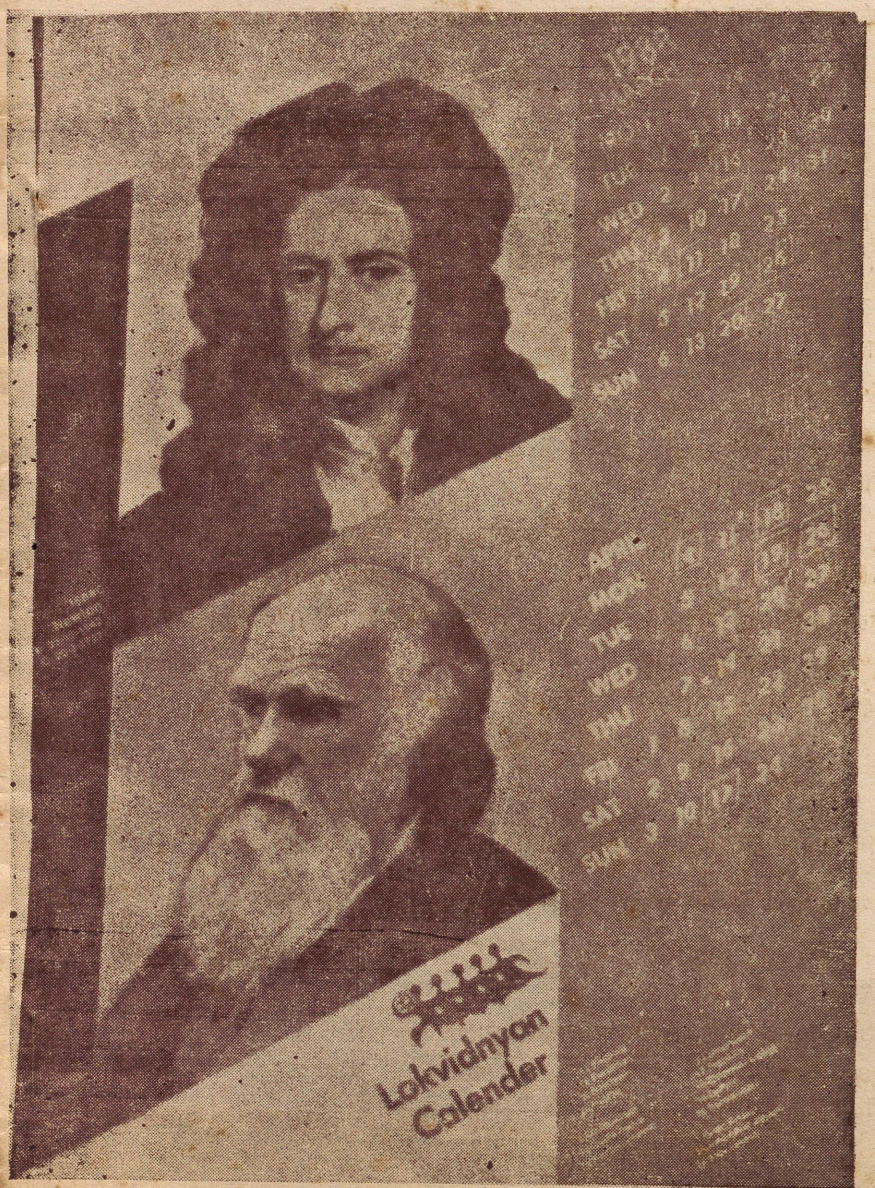

গ্রীন পার্টি পরিচিতি
সবুজ সম্ভাবনা (দুই)
বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ
পদ্ধতির সন্ধানে বিজ্ঞান
ভারতীয় প্রযুক্তি
আশা-নিরাশা
পরিবেশ
অশোকনগরে আর্সেনিক
মন্দিরবাজার
সঙ্কটগ্রস্ত এক ব্যক্তি
পারমাণবিক চুল্লী
তারাপুর
পশ্চিমবঙ্গে চাই না
সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
অ্যামনিওসেণ্টেসিস
গণবিজ্ঞান পরিচিতি
লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মার্চ-এপ্রিল 1988 একাদশ বর্ষ ☐ পঞ্চম সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 বি-ও-বি'র কথা

3 সবুজ সম্ভাবনা (দুই)
☐ সুমিত বিশ্বাস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর

5 পদ্ধতির সন্ধানে বিজ্ঞান
☐ স্বরূপ গুপ্ত

8 ভারতীয় প্রযুক্তি পরিস্থিতি : যুক্তি, তর্ক ও আশা-নিরাশা
☐ সুব্রত ভট্টাচার্য

10 আর্সেনিকে আক্রান্ত অশোকনগর : একটি সমীক্ষা
☐ রাজশেখর রায়চৌধুরী ও অপূর্ব সাহা

12 সার কারখানার বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলন : বর্তমান পরিস্থিতি
☐ নিজস্ব সংবাদদাতা

13 পরিবেশ আন্দোলন এবং সঙ্কটগ্রস্ত এক ব্যক্তি
☐ র.চ.

15 তারাপুর : কিছু বাস্তব সমস্যা
☐ অনু : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

17 না, পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু চুল্লী চাই না
☐ মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি

18 অ্যামনিওসেন্টেসিস : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
☐ দীপক

24 গণবিজ্ঞান : লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার
☐ রবীন মজুমদার

তৃতীয় প্রচ্ছদ—বিজ্ঞান দিবস '88
☐ শান্তনু ত্রিবেদী

প্রচ্ছদ :
মহারাষ্ট্র লোকবিজ্ঞান সংগঠনের সৌজন্যে

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। তবে সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। নিচে ঠিকানা দেওয়া হল।

বিদেশের গ্রাহক এবং প্রতিষ্ঠানিক গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বিদেশের গ্রাহকদের বাৎসরিক চাঁদা দশ ডলার। বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য ভারতীয় টাকায় বারো টাকা। প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা চল্লিশ টাকা। এজেণ্ট কমিশন : দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', c/o অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 106, সল্ট লেক, কলকাতা 700 064। সাক্ষাতে যোগাযোগ : 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা 700 009 (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে) সোমবার সন্ধ্যা 7-টার পর। সকলকে অনুরোধ করছি—**বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীটের ঠিকানায় চিঠি দেবেন না বা যোগাযোগ করবেন না।**

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী যেখানে পাবেন

☐ বাসন্তী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (ঘোষ কেবিনের পাশে)
☐ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের মিষ্টির দোকানের পাশে)
☐ দত্ত বুক স্টল—বাগবাজার (দ্বারিক ঘোষের পাশে)
☐ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
☐ মহীন্দর বুক স্টল ; কে সিং ; নন্দীকিশোর (নান্‌কা) ; শম্ভু মণ্ডল ; মহেন্দ্র মণ্ডল—কলেজ স্ট্রীট (পাতিরামের সামনে ফুটপাতের স্টলগুলোতে)
☐ মা কালী বুক স্টল—শ্রীমানি মার্কেটের বিপরীতে বিধান সরণীতে
☐ ঘোষ বুক স্টল—বিধান সরণী (বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে)
☐ রাণা'র দোকান—কলেজ স্কোয়ারের উল্টো দিকে
☐ দমদম স্টেশন ; শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুক স্টল
☐ অয়নায়ন—গড়িয়াহাট মোড়
☐ রায়গঞ্জ সাইন্স ক্লাব

বি-ও-বি'র কথা

আসুন না, নিজেদের দিকে তাকিয়েও হাসতে শিখি

বছর দেড়েক আগে'র এক সংখ্যায় (জুলাই-আগস্ট '86) বি-ও-বি'র পেছন দিকের মলাটের বাইরে চালু ঢঙে এক আত্মঘোষণা ছিল, "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী কেন পড়বেন" এই শিরোনামায়। তার প্রতিক্রিয়ায় (অর্থাৎ তাকে ঠাট্টা করে) এক সংখ্যা পরে (নভে-ডিসে '86) "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কর্মীর পক্ষে সওয়াল" এই নামে আর একটি উল্টো সুরের বিজ্ঞাপন (?) বার হয়। তাতে বি-ও-বি'র গুণাবলীর যে ফর্দ ছিল তার একটি নমুনা—"বি-ও-বি পড়লে আপনি নিজের ও অন্যের কাছে একজন বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন, যেটা আজ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেয়েও বড় কথা"—এমনি আরও সব।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই (সবার নয়) অবশ্য তখন এই আত্ম-অবমূল্যায়নমূলক তারল্যকে মুদ্রণযোগ্যতার দিক থেকে মাত্রাছাড়া মনে হয়েছিল। এক্ষেত্রে মাত্রার ব্যাপারটা এমন একান্ত ভাবেই ব্যক্তি-রুচির উপর নির্ভরশীল যে তা নিয়ে তর্ক চলে না। কাজেই সেই তর্কে না গিয়ে এরই সাথে যুক্ত অন্য আরেকটা যে কথা এই প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে সেটাই সবার সাথে ভাগ করে নিতে চাই। প্রশ্নের আকারেই রাখা যাক কথাটা : আমরা অনেকেই স্বেচ্ছায় ছোট-বড় যেসব কাজকর্মের সাথে (বি-ও-বি বার করাটাও তার মধ্যে পড়ে বলে আমি ধরে নিচ্ছি) যুক্ত থাকার চেষ্টা করছি সে সবেরই দুনিয়া কাঁপানো ভূমিকা, গুরুত্ব বা অবদান সম্পর্কে নিঃসংশয় বিশ্বাস বা অতি-সচেতনতা, ও তার থেকে জন্ম নেওয়া অতি-গুরুতর মনোভাবটা স্বাস্থ্যকর কিনা ? না কী, তুলনামূলক নিরাসক্তি বা কম-আসক্তিই (যাতে নিজের বা নিজেদের কাজের দিকে তাকিয়ে হাসতে শঙ্কা বোধ হয় না বা ব্যথা লাগে না) সংশ্লিষ্ট কাজ, আদর্শ ও ব্যক্তিদের বিকাশের পক্ষে বেশী অনুকূল ? আমার নিজের উত্তরটা সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করছি, অন্যদের মতামত জানতে পারব এই আশায়।

কিছুটা বেছে নিয়ে আর কিছুটা ঘটনাচক্রে সামাজিক চিন্তা বা কাজকর্মের যে শিবিরে এবং সেই শিবিরভুক্ত যে গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা এসে পড়ি তার গুরুত্ব যদি আমার সারা ভুবন জুড়ে বিরাজ করতে থাকে তবে সবচেয়ে বড় যে বিপদের আশঙ্কা থাকে তা হ'ল উগ্র, অসহিষ্ণু, "তোমার (বা তোমাদের)-চেয়ে-আমি (বা আমরা) সাচ্চা" এই ধরনের একদেশদর্শী মনোভাবের স্বীকার হয়ে পড়া ; চরিত্রের দিক থেকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সাথে যার মূলগত কোন ফারাক নেই। এই মনোভাবের অস্তিত্ব কাল্পনিক তো নয়ই বরং তা এতই ব্যাপক যে চোখে না পড়ে উপায় নেই—এমন কী সত্যানুসন্ধানে উৎসর্গীকৃত গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের আঙিনাতেও। বস্তুত তা আমাদের মুক্তি আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যের অন্যতম দুঃখজনক ও অগৌরবময় উত্তরাধিকার—যাকে আমরা অতিক্রম করতে পারছি না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অবৈজ্ঞানিক বা অপবৈজ্ঞানিক অন্ধতার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যে বৈজ্ঞানিক (?) দম্ভ, পণ্ডিতম্মন্যতা, সত্যের একচেটিয়া মালিকানার উক্ত বা অনুক্ত দাবী, এবং বিরোধী মতের প্রতি তাচ্ছিল্যভরা অমর্যাদার সুর আমাদের কথা আচার-আচরণ ও রচনাতে প্রায়ই এসে পড়ে—তা'র বুলি আলাদা কিন্তু মানসিকতায় তা ঐ একই ধরনের অবুঝ গোঁড়ামীরই সমগোত্রীয়। এমন কী ব্যাপকতর অর্থে একই শিবিরের মধ্যেও ক্ষেত্রবিশেষে অন্যতর মতের অস্তিত্ব দেখলেই লাল-কাপড়ের-সামনে-শিং-ওয়ালা-ষাঁড়ের দশা হয় আমাদের। অন্যদিকে নিজের প্রিয় ধারণাটির বিদ্বেষহীন সমালোচনার (ঠিক বা বেঠিক) মুখোমুখি হলেও অতি-স্পর্শকাতর এক আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ার খপ্পরে গিয়ে পড়ি। এতে তিক্ততাহীন যে স্বাস্থ্যকর বিতর্ক বা আলোচনার (যার মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্রূপ বা কটূতা মুক্ত কৌতুকের অবকাশ অবশ্যই আছে এবং তা কাম্য) মধ্যে দিয়েই একমাত্র আমরা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করতে পারি, তা কঠিন হয়ে পড়ে।

নিজেদের চিন্তা ও কর্মের দ্বারা স্ব-সম্মোহিত অবস্থা আমাদের এমন সব স্ববিরোধী অবস্থায় নিয়ে যায় যা সততা বা আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে না। যেমন, প্রাতিষ্ঠানিক আমলাতান্ত্রিকতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, তারকাবাদের (**starism**) মুখর সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যেই এ ধরনের প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে আমরা বাধা বোধ করি না বা লজ্জা পাই না, এবং সুযোগ পেলেও সে ত্রুটি শুধরে নিই না। এমন ঘটনাও ঘটে যে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য বা তত্ত্বের সৎ সমালোচনাকে মর্যাদা দেব কি না সেটা আমাদের গোষ্ঠীর সাথে সমালোচকের নৈকট্য, বা তার 'নগণ্য'তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। তেমন তেমন ক্ষেত্রে "আমাদের পত্রিকায় ভুল থাকে না" এমন কথাও অসংকোচে বলে ফেলি। এই আত্মসম্মোহন-জনিত বিপথগামী আত্মশ্লাঘা শুধু নিজেদের বিকাশকেই ব্যাহত করতে পারে। অন্যদিকে, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগতভাবে একটি বিশেষ মুহূর্তে দুর্বলতর অবস্থায় যাঁরা আছেন তাঁদের স্বকীয় চিন্তা ও চেতনা বিকাশের সহায়ক শক্তি হয়ে ওঠার বদলে খর্ব্বকারী, সীমাবদ্ধকারী ও অবদমনকারী একটি ভূমিকায় আমরা চলে যাই। আমাদের অবস্থাটা অনেকটা হয়ে দাঁড়ায় আমলাতন্ত্রহীন আমলার মত—একই সাথে করুণ, হাস্যকর ও ক্ষতিকর।

কার্যত এই "উচ্চ-ভাবে" স্ব-সম্মোহিত আমাদের সত্তার চেহারা হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা "রাম গরুড়ের ছানা" মার্কা নিরুত্তাপ পবিত্র সত্যের কাঞ্চনজঙ্ঘায় আসীন এক চোখে-আঙুল-দাদা মহর্ষির মত ; অথবা, ভ্রুকুটি-কুটিল, স্ফুরিত-নাসা, দাঁতে-দাঁত-ঘষা এক মূর্ত্ত বিদ্বেষের ; অথবা কেবল

বিদ্রূপের-হাসিতে-বাঁকা-ঠোঁট-ওয়ালা এক মূর্ত্ত তাচ্ছিল্যের। এমন মনের কাছে সত্যের বহুমাত্রিক রূপ বা তার রামধনু রং ধরা পড়া—এমন কী তাকে স্বীকার করাই শক্ত। বদলে বিভিন্ন একমাত্রিক বা একরঙা সত্যের একাগ্র উপাসক হয়ে ওঠা ও হাতি দেখা অন্ধদের মত উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানিই হয়ে ওঠে আমাদের বিধিলিপি।

এর বদলে অন্যদের প্রতি যেমন, তেমনই নিজেদের চিন্তা ও কাজের প্রতি যদি একটি স্বাস্থ্যকর সংশয়ের ভাবকে সদা জাগ্রত রাখতে পারি তবে তা হয় তো আমাদের গোঁড়ামির ভারসাম্যহীনতা থেকে, দম্ভ বা আস্ফালনের (উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত) তুচ্ছতা থেকে, সর্বজ্ঞতাবাদ, নির্ভুলতাবাদের মূঢ়তা থেকে কিছুটা মুক্ত থাকতে সাহায্য করতেও পারে। সেই কারণেই আত্ম-সংশয়ী এই মানসিকতা সত্যানুসন্ধানের জন্য, সৃজনশীলতার জন্য, মূলত একই উদ্দেশ্যগামীদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার জন্য, এবং কাঙ্ক্ষিত চিন্তা-ভাবনা ও কাজের ব্যাপকতর প্রসারের জন্য আরও কার্যকরী। এবং আমার বিবেচনায় এই মানসিকতা অর্জনের একটা অস্ত্র হতে পারে আমাদের নিজেদের অসম্পূর্ণতা, মূঢ়তা, ত্রুটি ও ব্যর্থতা (কার বা কাদের নেই ?) নিয়ে নিজেদেরই হাসতে পারার মত কৌতুকবোধকে উৎসাহ দেওয়া।

অবশ্যই আমি আন্তরিকতাহীন ফাঁকা, কৃত্রিম, ভঙ্গীসর্ব্বস্ব কোনো আত্ম-সন্দেহবাদের কথা বলছি না। সে ধরনের তিক্ত আত্মঘাতী আত্ম-সংশয়ের পক্ষেও কোন ওকালতি করছি না যা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে, অন্যদের সম্পর্কে সমস্ত শ্রদ্ধা, মর্যাদাবোধ বিশ্বাস বা আশাকে ধ্বংস করে এক শূন্যতাবোধের প্রতি ঠেলে দিতে পারে। আসলে এক সময়কার অন্ধ গোঁড়ামীই যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসেবে ব্যর্থতার মুহূর্ত্তে অনেকসময় এ ধরনের বিধ্বংসী আত্ম-বিদ্রূপকে ডেকে আনে—আজকের স্বাস্থ্যকর আত্ম-সংশয় এমন সর্বনেশে আগামীকালের বিরুদ্ধে একটা বড় প্রতিষেধক টিকা। আর এক ধরনের আত্ম-কৌতুকপরায়ণতাও আছে যা স্থানে-অস্থানে, যখন-তখন, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নিজের পঙ্গুত্বকে চড়া সুরে জনসমক্ষে জাহির করার মধ্যে দিয়ে একধরনের মর্ষকামী (masochistic) তৃপ্তি পায়।

স্বাস্থ্যকর আত্ম-সন্দেহবাদ বলতে এগুলিকে বাদ দিয়েই আমি বোঝাতে চেয়েছি, যা আমার আত্ম-বিশ্বাসকে অবিচলিত রেখেও আমার সীমাবদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং কাজে কাজেই আমার বিকাশে সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গেই অধুনা প্রয়াত এক ব্যক্তির আমার কাছে প্রিয় এক উক্তি দিয়ে এই একঘেয়ে আলোচনা শেষ করছি—**"Taking oneself too seriously is a sign of immaturity"**। কথাটা বার্ট্রাণ্ড রাসেল শুধু ব্যক্তি প্রসঙ্গেই বলেছিলেন। আমার বিবেচনায় কথাটা যে কোন যৌথ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

—সুভাষ গাঙ্গুলী

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8 নং ধারা অনুযায়ী ফরম IV বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম—	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা—	বাংলা ও ইংরেজী
প্রকাশনার স্থান—	52/9C বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-700 0'2
প্রকাশকাল—	দ্বিমাসিক
প্রকাশকের নাম—	রবীন মজুমদার
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	কেমিক্যাল টেকনোলোজি বিভাগ 92 এ. পি. সি. রোড, কলিকাতা-700 009

মুদ্রকের নাম, জাতি, ঠিকানা—ঐ

সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—ঐ

প্রেসের নাম ও ঠিকানা—ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং সেন্টার, 18B ভুবন ধর লেন, কলি-700 012

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য

(স্বাঃ) রবীন মজুমদার, প্রকাশক, 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা

॥ সবুজ সম্ভাবনা (দুই) ॥

গ্রীন পার্টির ধারাবাহিক এই পরিচিতির প্রথম অংশে (জানু-ফেব্রু '88) ছিল সবুজদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর একটি প্রাথমিক সার সংক্ষেপ। এবারে থাকছে গ্রীন পার্টির গড়ে ওঠার প্রথম দিককার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যে সব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে গ্রীন পার্টি গড়ে উঠেছে সেগুলিকে বোঝা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একটি আলোচনায় কয়েক দশক অন্তর এক একবার জার্মান যুবকদের এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। তাতে নাৎসী যুব আন্দোলনের কথাও বাদ যায় নি, যেখানে জার্মানীর সীমানার ভিতর প্রকৃতি যে পবিত্র এই শিক্ষাও দেওয়া হয়েছিল। অন্যরা অবশ্য '60-এর দশকের ইউরোপ-আমেরিকা জোড়া ছাত্র-যুব আন্দোলন বা বিকল্প সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মধ্যেই এর প্রথম ইঙ্গিত লক্ষ্য করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সবুজ রাজনীতিকে বুঝতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান সমাজের পটভূমিতেই তাকে বুঝতে হবে, এবং তা বুঝতে গেলে আরও একটি অন্ধকার ছায়াও এসে পড়ে, তা হোল নাজী যুগ।

যুদ্ধ পরবর্তী যুগে বড় হয়ে ওঠা ছেলে মেয়েরা তাদের অতীত সম্পর্কে এক ধরনের নৈঃশব্দ্য দেখতে পায়। এই সময় থেকে বয়স্করা জার্মানীকে শিল্পনির্ভর, স্বচ্ছল এক দেশে রূপান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন বাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, এবং উৎপাদন-নির্ভর এক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মূলত ছাত্র-যুবদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্নটি বিশেষত ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের কাছে খুবই জরুরী হয়ে উঠছিল। কারণ জার্মান উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে চরম আমলাতান্ত্রিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাচ্ছিল।

এই আন্দোলন '60-এর দশকের শেষদিকে এক বিশাল আকার ধারণ করে। কিন্তু একই সাথে তা বহুধাবিভক্ত হতে এবং ভেঙে পড়তে শুরু করে। কেউ কেউ হয়ে ওঠেন গোঁড়া মার্কসবাদী। অন্যরা নানান ধরনের উদারনৈতিক বামপন্থী বা স্বতস্ফূর্ততাবাদী অনেক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যান। অল্প কিছু লোক সত্তরের দশকের মধ্যভাগে সন্ত্রাসবাদী হয়ে পড়েন (যেমন বাডের মেইনহফ গোষ্ঠী), কিন্তু অনেকেই রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক রূপগুলিতে আস্থা হারান।

'74 সালের পর থেকেই এই সব মানুষেরা লক্ষ্য করতে শুরু করেন যে পরিবেশ ধ্বংস তথা নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র গজিয়ে ওঠার বিরোধিতায় এক ধরনের নাগরিক আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ছাত্র বিক্ষোভ থেকে এই নাগরিক আন্দোলন "আদর্শ জার্মানী"র ধারণাকে প্রশ্ন করার উপাদান খুঁজে পায়। এই প্রথম বহু সৎ জার্মান, যাঁদের অনুগত ও বাধ্য হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল, তাঁরা প্রশ্ন করতে শুরু করেন। এই সব প্রশ্ন ছিল বিশাল রাজপথ তথা আকাশচুম্বী বাড়ী ভিত্তিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে, প্লুটোনিয়াম উৎপাদনকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রসঙ্গে বা ক্রমবর্ধিত নদী ও বায়ু দূষণের প্রসঙ্গে। সরকারী পরিকল্পনার ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সাধারণ নাগরিকদের আর অন্ধকারে রাখতে সফল হচ্ছিল না।

এই সময়ে ইকলজি ভিত্তিক ধ্যানধারণায় প্রকাশিত সাহিত্যও জন-প্রিয় হয়ে ওঠে এমনটা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে ক্লাব অফ রোম প্রকাশিত 'লিমিটস টু গ্রোথ', হার্বার্ট গ্রুহল লিখিত 'অ্যা প্ল্যানেট ইজ প্লাণ্ডারড' বা ইভান ইলিচ লিখিত বিভিন্ন বই তথা প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। সত্তরের দশকের শেষদিকে বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিও নাগরিক আন্দোলনের অন্যান্য ধারার সাথে যৌথ উদ্যোগ শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ওই গোষ্ঠীগুলির মহিলা কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে। বহু ধরনের চিন্তাভাবনা সম্বলিত এই নাগরিক আন্দোলনের একটি বড় শিক্ষা ছিল—সমস্ত ধরনের মতামতকে জায়গা দেওয়া, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তোলা এবং তাদেরকে একই ধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা। এই ধারাটি আজও সবুজ রাজনীতিতে বয়ে চলেছে।

মধ্য সত্তরে আরও একটি আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যা ছাত্র প্রতিবাদ, নাগরিক আন্দোলন এবং আধ্যাত্মিকতা তথা ব্যক্তিমানস উন্নতিকরণ আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত ছিল। তা হল "বিকল্প গড়ে তোলার" আন্দোলন। বিকল্প সংস্কৃতি ভিত্তিক জীবনে আগ্রহী মানুষেরা শুরু করেন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, পুনর্ণবীকরণ-যোগ্য শক্তি ব্যবস্থা, জৈব কৃষি এবং সামগ্রিকতাবাদী স্বাস্থ্যব্যবস্থা এরই নানান দিক। সুমাচারের লেখা "স্মল ইজ বিউটিফুল" ও আরও অন্যান্য বই এদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই সমস্ত আন্দোলনকে প্রথমদিকে বিদ্রূপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। "ইউটোপিয়া" শব্দটিকে তার ব্যাঙ্গার্থক অর্থ থেকে বের করে এনে সজীব করে তোলার প্রয়াসে আন্দোলনকারীরা বিরুদ্ধতার মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন "স্বপ্ন দেখার সাহস যদি তুমি না দেখাও, তবে সংগ্রামের জন্য শক্তিও অর্জন করতে পারবে না।"

1978 সালের মধ্যেই সবুজ আন্দোলনের সমস্ত উপাদানগুলি দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল। অবশ্য '73 সাল থেকেই একটি ছোট গোষ্ঠী কিছু কিছু সবুজ নীতি, যথা নির্জোট পররাষ্ট্রনীতি বা পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে কথা বলছিল। এর নাম ছিল অ্যাকশন কমিটি অফ ইন্ডিপেণ্ডেণ্ট জার্মানস। এর পরে পরেই গড়ে ওঠে আর একটি গোষ্ঠী—গ্রীন অ্যাকশন ফিউচার। '78 সালের নির্বাচনে লোয়ার স্যাক্সনি, রাইন ওয়েষ্টফ্যালিয়া এবং স্লেসউহগ-হলষ্টেইনে এই ধরনের স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি প্রার্থী দেন। কিন্তু প্রতিনিধিত্বর জন্য প্রয়োজনীয় 5 শতাংশ ভোট তাঁরা পাননি।

এর পর 1979 সালের ইউরোপিয়ান পার্লিয়ামেণ্টের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলিকে এক জায়গায় আনার জন্য চেষ্টা চালান হয়। এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয় ইউনিয়ন অফ জার্মান ইকলজিক্যাল সিটিজেনস্। কিন্তু নির্বাচনের রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ করলে দুর্নীতি দেখা দিতে পারে বা স্থিতাবস্থার অঙ্গীভূত হওয়ার ভয় থাকতে পারে এই টেনসানও একই সাথে কাজ করতে শুরু করে।

1979 সালের মার্চ মাসে ফ্রাঙ্কফুর্ট কনভেনশনে পূর্বোক্ত গোষ্ঠীগুলি 'অ্যাকশন থার্ড ওয়ে' ও 'ফ্রি ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' নামক আরও দুটি গোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে "ফারদার পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন—দ্যা গ্রীনস" তৈরী করেন। এই কনভেনশন দুটি বড় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। একটি হল নিউক্লিয়ার কার্যক্রম মুক্ত ইউরোপ, অপরটি হল বিকেন্দ্রিত "আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক ইউরোপ"। এই নির্বাচনেও গ্রীনসরা 3·2 শতাংশ ভোট পান। ফলে নিয়তম 5 শতাংশ ভোট না পাওয়ায় তাঁরা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান না।

গ্রীন পার্টির সাংবিধানিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় 1980 সালের জানুয়ারী মাসে কার্লশ্রুহে নামক স্থানে। এতে 1004 জন প্রতিনিধি যোগ দেন। এই সভায় সংবিধানকে ঘিরে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয় এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ওই বছরই মার্চ মাসে সারব্রুফেনে প্রতিনিধিরা দ্বিতীয়বার মিলিত হন। এখানে এক নতুন কর্মপরিষদ নির্বাচিত হয় এবং ফেডারেল কর্মসূচী গৃহীত হয়। জুন মাসের ডর্টমুণ্ড সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নেন জার্মান জাতীয় পার্লিয়ামেণ্টের অক্টোবর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁরা মাত্র 1·5 শতাংশ ভোট পান, যদিও কোন কোন শহর পরিষদে তাঁরা প্রতিনিধিত্বের অধিকার পান। এরকমটা প্রথম ঘটে ব্রেমেনে 1979 সালে। এই সময়ের মধ্যেই গ্রীনরা ইকলজিভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য তাঁদের কর্মসূচীকে আরও সুগ্রথিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ করে তোলেন। '82 সালে গ্রীন পার্টির দুই সদস্য লেখেন "গ্রীন টাইমস : পলিটিকস ফর অ্যা ফিউচার ওয়ার্থ লিভিং"। ওই একই বছর নভেম্বর মাসে হ্যাগেনে অনুষ্ঠিত হয় গ্রীন পার্টির বাৎসরিক সম্মেলন। এই অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয় মহিলাদের সমবেত প্রতিবাদের জন্য। কর্মসূচীর বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করার জন্য যে আলাদা আলাদা উপসমিতি তৈরী করা হয়েছিল তার মহিলা সদস্যরা বলেন যে তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। ফলত তাঁদের তৈরী করা কর্মসূচী তাঁরা আলাদা জমা দেন। এই অধিবেশনে অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে সাঙ্ঘাতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়, ফলে একটি দুই পাতার প্রস্তাব মাত্র গ্রহণ করা হয়। জানুয়ারী 1983-তে সিন্ডেলফিনগেনে আয়োজিত অধিবেশনে শেষ অবধি 39 পাতার সম্পূর্ণ ফেডারেল কর্মসূচীটি গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের পরেই গ্রীনরা 6 মার্চ 1983 সালের বুণ্ডেষ্ট্যাগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের দিকে মুখ ফেরান। এবং অনেককেই অবাক করে দিয়ে 5·6 শতাংশ ভোট সংগ্রহ করে জাতীয় সংসদে প্রবেশ করেন। এই নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ব্যর্থতা থেকে বোঝা গেল, প্রথাগত বাম রাজনীতি জনচিত্তে আগের মতো আর দাগ কাটছে না। ফলে নাগরিক স্বার্থরক্ষা করার জন্য ভবিষ্যতে গ্রীনসরা যে উপযোগী ভূমিকা নিতে পারে এ রকম একটি ধারণা তৈরী হতে শুরু করে।

গ্রীন পার্টির গড়ে ওঠার বছরগুলোয় যে সব ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তাঁরা এসেছিলেন ডান ও বাম উভয় দিক থেকেই। পেত্রা কেলী, যাঁর নাম সবুজ রাজনীতিতে জড়িয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে, তিনি ছিলেন সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলে 1979 সাল অবধি। হার্বার্ট গ্রুহল এসেছেন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দল থেকে। '60-এর দশকের জার্মান ছাত্র যুব আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা রুডি ডয়টস্কে (রুডি মারা যান 1980 সালে) বা পূর্ব জার্মানীর বিক্ষুব্ধ তত্ত্ববিদ রুডল্ফ বাহরো তো মার্ক্সবাদ বা বামপন্থার সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন।

এত বিভিন্ন পথের মানুষের একজায়গায় থাকার প্রশ্নটি স্বভাবতই যথেষ্ট কৌতুহল জাগায়। এ প্রসঙ্গে গ্রীনদের দেওয়া উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক সচেতনতার ছাপ: মানবজীবন তথা প্রকৃতির ধারাবাহিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব তাঁরা অনুভব করেছেন। এটাই তাঁদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

—সুমিত বিশ্বাস
—সুজয় মুখার্জী
—সুরঞ্জন কর

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

● ঘোষণা ●

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক 12 টাকা। যাঁরা ডাকে পত্রিকা নেন, ডাক খরচ বাবদ তাঁদের দেয় আরো 3 টাকা—অর্থাৎ মোট 15 টাকা। যে সব গ্রাহক পত্রিকা হাতে হাতে নেন অথচ 15 টাকা চাঁদা দিয়েছেন তাঁদের গ্রাহক পদের সময়সীমা হিসাবমতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

□ স: ম:, বি-ও-বি

পদ্ধতির সন্ধানে বিজ্ঞান

স্বরূপ গুপ্ত

আগের দিনের আসরে 'বিজ্ঞানদা' বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন—তা প্রকাশিত হয়েছিল বি-ও-বি'র গত সংখ্যায়। তারই জের টেনে এবারে তাঁর আলোচ্য—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি ও কেমন।

আসরে আবির্ভূত হয়েই বিজ্ঞানদা সেদিন সুমিতার খোঁজ করলেন—কই সুমিতা আসেনি? যাঃ—

রহমান বলল—কেন, আমরা কি কেউ নই?

বিজ্ঞানদা—না, তা নয়, সুমিতার খুব আগ্রহ ছিল—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানার···

'এই যে আমি এসে গেছি'—পেছন থেকে সুমিতার গলা শোনা গেল। সকলেই হাসল। বিজ্ঞানদাও বসে পড়লেন।

এলোমেলো কিছু কথা হচ্ছিল। সুমিতাই তাগাদা লাগাল—কই আপনি এবার আরম্ভ করুন।

বিজ্ঞানদা বললেন—আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু—বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অথচ দেখো, আমি যদি একা বলি আর তোমরা সুবোধ ছাত্র-ছাত্রীর মত মুখ বুজে শুনে মেনে নাও তো সেটা হবে বিজ্ঞানবিরুদ্ধই—।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা-প্রসঙ্গে সেদিন যে আমি বলেছিলাম—বিজ্ঞান হ'ল চারটি লক্ষণযুক্ত জ্ঞান চর্চা—তোমরা যদি লক্ষ্য করো তো দেখবে সেই লক্ষণগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে পদ্ধতির কথা। ···তবে সেটাকে আরও খোলসা করে বলা দরকার। দেখো, প্রাচীন গ্রীসের আয়োনিয়ান সভ্যতার সময় থেকে বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতা যাত্রা শুরু করেছে, কেন্দ্র পাল্টে গেছে কিন্তু ধারা থেকেছে অব্যাহত—গ্রীস থেকে রোম তারপর দক্ষিণ এশিয়া মিশর ব্যাবিলন—মধ্যপ্রাচ্য অবশেষে ইয়োরোপ। তা এইসব পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ, আবিষ্কার যে হ'তো তার কি কোন বিশেষ পদ্ধতি ছিল? থাকলেও তা কি সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হ'তো? সঠিক জানা নেই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিষয়ে প্রথম সুস্পষ্ট মতামত রাখেন ত্রয়োদশ শতকের ইংরেজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক রজার বেকন। তিনি পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেন। কিন্তু একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ রূপ সবিস্তারে হাজির করেন ইংলণ্ডেরই আর এক বেকন—ফ্রান্সিস বেকন, আরও প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে। পেশায় রাজনীতিক, নেশায় দার্শনিক এই ফ্রান্সিস বেকনই বলতে গেলে আজও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনার ভিত্তি, যদিও তার তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও ব্যবহারিক সংস্কার ঘটেছে। সুমিতা বলে ওঠে—আপনি তো এবার বলতে শুরু করবেন—পদ্ধতিটা কি, কেমন, কিন্তু তার আগেই আমি জানতে চাই পদ্ধতিটা কি জন্য, কি করার পদ্ধতির কথা হচ্ছে? চাষ করার না বই পড়ার না বিজ্ঞানে গবেষণা করার?—আমি কিন্তু বুঝিনি···

—আমি বলছি—প্রয়োজনে আপনি শুধরে দেবেন, বলে বিজ্ঞানদাকে অবকাশ না দিয়ে প্রতুল বলে,—পদ্ধতি হ'ল জ্ঞানার্জনের, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের, হ্যাঁ গবেষণারও।

সুমিতা ফোঁস করে ওঠে—আমি ত' বিজ্ঞানী হতে চাই না, জ্ঞানীও নই, আমার তাহলে না বুঝলেও চলবে। মুচকি হেসে বিজ্ঞানদা বলেন—জীবনের যে কোন প্রয়োজনে কিভাবে এগোতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা যদি ফরমূলা আকারে জানা থাকতো তো আমি বাতলে দিতাম। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এত সর্বব্যাপী প্রয়োগ হ'তে পারে কিনা সেটা আলাদাভাবে বিচার্য। আপাতত, প্রতুল যা বলল তাই মেনে নিয়েই এগোন যাক না। পরে না হয় আবার বিবেচনা করা যাবে যে বেকনীয় পদ্ধতির ব্যাপকতা কতটা।···একটা উদাহরণ নেওয়া যাক—বুঝতে সুবিধে হবে। মানুষ—আমি প্রাচীন মানুষের কথা বলছি—অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে, চোখে না দেখা গেলেও আমরা রয়েছি বায়ু-সমুদ্রে। এখন এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেউ হয়তো প্রাথমিক ধারণা হাজির করলো যে মাটি ও জলের মতই বাতাসও বস্তুমাত্র। কিন্তু তা প্রমাণ করা যাবে কি করে? দরকার হ'ল কোন পরীক্ষার। মানুষ যখন ওজন করা শিখল, তখন কিছু কৌশল আশ্রয় করে প্রথমে ওজন করল একটি বায়ুশূন্য পাত্র। তারপর ওজন করল বায়ুভর্তি সেই পাত্র। দেখলো বায়ুভর্তি পাত্রটির ওজন বায়ুশূন্য পাত্রটির চেয়ে বেশী। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সে সিদ্ধান্ত করল বাতাসেরও ওজন আছে। এবার সে অন্যান্য অভিজ্ঞতা ও তথ্য দিয়ে যাচাই ও বিশ্লেষণ করল তার পরীক্ষার ফলকে। মানুষ জানে জল বা মাটিরও ওজন আছে, আর এও দেখেছে যে জলকে ক্রমাগত ফোটালে তা বাতাসে মিশে যায়—কিছুই পড়ে থাকে না। অতএব সে নতুন সিদ্ধান্ত করতে পারে মাটি-জলের মতই বাতাসও বস্তুমাত্র তবে তাকে খালি চোখে দেখা যায় না। এমনি করে ধাপে ধাপে এগোল প্রাথমিক ধারণা-পরীক্ষা-সিদ্ধান্ত। তাকে ঘিরে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর প্রশ্ন, নতুন করে প্রাথমিক ধারণা—যাকে ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন প্রকল্প বা হাইপথেসিস—তাকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য বা জ্ঞান থেকে প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন বা পরিমার্জন—আবার পরীক্ষা। এভাবে ক্রমশ উন্নততর, পূর্ণতর জ্ঞান, সূক্ষ্মতর পরীক্ষা; প্রকল্প গৃহীত হলে তা উন্নীত হয় তত্ত্বে। এভাবেই এগিয়ে চলে জ্ঞান, অধিগত হয় কৃৎকৌশল, জাগতিক নিয়মাবলী। এভাবে, একটা পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রায়শই দেখা যায় তা সবচেয়ে সুসংবদ্ধ, সংক্ষিপ্ত, সরল ও সুন্দর।

এখন, তোমরা খেয়াল করেছ নিশ্চয়—আমাদের উদাহরণে আমরা কিছু লজিক বা যুক্তির আশ্রয় নিয়েছি। যেমন, সব

বস্তুর ওজন আছে, বাতাস যদি বস্তু হয় তবে বাতাসেরও ওজন থাকতে হবে। এ হ'ল গিয়ে যাকে বলে অবরোহী তথা ডিডাকটিভ লজিক। যদি আমরা উল্টো পথ নিতাম, যেমন ধরো, পরীক্ষায় ধরা পড়লো—আমাদের চারপাশের বাতাসে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে আবার সমুদ্রের উপর বা পাহাড়ের উপর বা মাটির নীচের বাতাসেও আছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। কাজেই সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হ'ল—বাতাস মাত্রই নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ—এ হ'ল আরোহী তথা ইনডাকটিভ লজিক, বিশেষ থেকে সাধারণ। তাহ'লে মোটের উপর দাঁড়ালো যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—যা ফ্রান্সিস বেকন চিহ্নিত করেন—হ'ল: অভিজ্ঞতা বা তথ্যভিত্তিক প্রকল্পায়ন—পরীক্ষা—পর্যবেক্ষণ—বিশ্লেষণ—সিদ্ধান্ত—তত্ত্ব। আর প্রকল্পায়ন, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত এ সবে ডিডাকটিভ বা ইনডাকটিভ লজিকের প্রয়োগ। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ল—অভিজ্ঞতা বা তথ্য—তা যেন সর্বজনগ্রাহ্য বা অবজেকটিভ হয়, যেন তা ব্যক্তিবিশেষে পরিবর্তিত বা সাবজেকটিভ না হয়।

আমাদের জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ নয়। একটা জায়গায় পৌঁছে যেই পুরনো প্রশ্নের কিছু উত্তর পাওয়া গেল, নতুন প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, আরও দশটা। এই প্রশ্ন ওঠা বা করা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন। প্রশ্ন যদি হয় সুশৃঙ্খল (অর্থাৎ তা যদি চালু জ্ঞান অভিজ্ঞতা, তথ্য নিয়ম লঙ্ঘন না করে) তবে তাকে এড়ানো মানে থেমে যাওয়ার সামিল। এই জন্যই আমি এর আগের দিন বলেছিলাম বিজ্ঞান পদ্ধতিগতভাবেই সর্বদা বিকশিত হয়, বলেছিলাম যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই একটা সংশোধনী প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল।

রহমান অনেকক্ষণ ধরেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। একটু ফাঁক পেয়েই প্রশ্ন করে—বিজ্ঞানীদের কাছে এই পদ্ধতির কতটা মূল্য আছে জানি না, থাকতেও পারে; কিন্তু এতে সাধারণ মানুষের কি উপকার হবে? কিভাবে?

সুমিতা যোগ করে—তাছাড়া যারা ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি চর্চা করে তাদেরও কি এই পদ্ধতি কাজে আসে? বিজ্ঞানদা—দাঁড়াও দাঁড়াও, আগেই এত প্রশ্ন হাজির করো না, অবশ্য প্রশ্ন দুটো খুবই সঙ্গত। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে 1980'র 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকায়—পুরো বারোটি সংখ্যা জুড়ে ডঃ পি. এম. ভার্গব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। তারপর 1981 অক্টোবর সংখ্যা 'সায়েন্স টুডে'তেই ডঃ অনিল সদগোপাল একটি প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন—কেন আমাদের জাতীয় জীবনে পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে এত বেশী অযৌক্তিকতা, অবাস্তবতা। ডঃ ভার্গব উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছিলেন—বিজ্ঞান আপ্তবাক্যের ধার ধারতে বাধ্য নয়, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা পুঁথি-বিশেষ সেখানে শেষ কথা হতে পারে না, যেমনটি হয় যে কোন গোঁড়ামির ক্ষেত্রে—সে ধর্মই হোক আর হোমিওপ্যাথিই হোক; দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞানে ব্যক্তিনিরপেক্ষ জ্ঞান ও তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ, আর সেসব জ্ঞান ও তথ্য বার বার প্রমাণ করা যায়, দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ ভাবে সত্যতা যাচাই করা যায়, এবং ভবিষ্যৎ গতিপথের রূপরেখা আন্দাজ করা যায়। ডঃ সদগোপাল দেখিয়েছেন কিভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় তথা সমাজজীবন প্রাথমিক সত্য ও তথ্যাদি উপেক্ষা করে কল্পিত সমস্যার সমাধানের মরি-চীকার পেছনে ছুটছে—অবশ্য তাতে চিরকালের স্বার্থান্বেষী মহল পুষ্টও হ'চ্ছে। যেমন মনে করা যাক, সামাজিক বাস্তবতা উপেক্ষা করে কোন অঞ্চলের সমস্ত গরীব মানুষদের যথেষ্ট টাকা-পয়সা ও সরঞ্জাম দান করা হ'ল। কালক্রমে দেখা গেল ঐ গরীবরা প্রায় সকলেই গরীবই রয়ে গেছে, ধনীরা হয়েছে আরও ধনী। আমি এসবের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এঁরা দুজন হ'লেন সেই বিরাট একটা অংশের প্রতিনিধি, যাঁরা মনে করেন ব্যক্তি বা সমাজজীবনের যে কোন ক্ষেত্রে পরিমার্জিত বেকনীয় পদ্ধতি প্রগতির পথে কাজে লাগানো যায়।

চুপ করে শোনার যার অশেষ খ্যাতি সেই কৃষ্ণ এবার কথা বলে—আপনি কিন্তু উল্লেখ করছেন না যে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে জ্ঞানচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ইতিহাস ও সামাজিক প্রগতির ধারা অনুধাবন করবার ও পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে সব চেয়ে বড় অবদান মার্কসবাদের।—আলাদা করে আমি তা উল্লেখ করিনি, কারণ এ প্রসঙ্গে অনেক বিতর্ক এসে যেতে পারে,—বিজ্ঞানদা বোধহয় পাশ কাটাতে চান। প্রতুল মোড় ঘোরায়—আপনার বক্তব্য থেকে তাহ'লে এই দাঁড়াচ্ছে না যে, বলতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মেরও আগে ফ্রান্সিস বেকন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে যা বলেছিলেন সেটাই আজও সত্য এবং তার কোন বিকাশ ঘটে নি?

বিজ্ঞানদা—তা কেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে পরিমার্জন, বিকাশ ঘটেছে সেকথা আমি তো আগেই উল্লেখ করেছি। বেকনীয় পদ্ধতি মোটের উপর, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ—আরও স্পষ্ট করে বললে—প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের পদ্ধতি হিসেবেই বিবৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের জ্ঞানচর্চা তাকে আরও ব্যাপকতর উন্নততর ভিত্তি দিয়েছে।

বিজ্ঞানদা প্রসঙ্গ শেষ করার ভঙ্গীতে উঠবার চেষ্টা করতেই রহমান নিরস্ত করে—আরও একটু আলোচনা হওয়া দরকার। ইদানীংকালে আবিষ্কারের পদ্ধতি, বিজ্ঞানের ইতিহাস, দর্শন নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নামে একটি প্রায় অপরি-বর্তনীয় স্থানু, কঠোর পদ্ধতির কথা বলে এবং স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে কতকগুলো ধারণাকে গ্রহণ করার ফলে বিজ্ঞান এক বদ্ধ কানাগলিতে গিয়ে পৌঁছেছে—ঘনিয়ে তুলেছে সংকট। আপনি কি পল ফেইরাবেণ্ডের "এগেইনস্ট মেথড" বইটা পড়েছেন? ফেইরাবেণ্ড সেখানে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্ব অতি সীমিত বলে বর্ণনা করেছেন। বহু উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে এমনকি বিজ্ঞানের নিজস্ব সীমিত ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সাধারণ পদ্ধতি কাজ করেনি। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একদল বিজ্ঞানীর ও কিছু লোকের স্ব-কপোল-কল্পনা মাত্র। বিজ্ঞানকে

একটা গোঁড়ামিই বলেছেন তিনি: ঈশ্বরের স্থান নিয়েছে যুক্তি। জীবনসংগ্রামে মানুষের ব্যবহৃত বহু হাতিয়ারের একটি হল বিজ্ঞান। অবজেকটিভিটির দোহাই পেড়ে ক্ষতি অনেক হয়েছে। এবার বিজ্ঞানকে একটু সাবজেকটিভ হতে হবে। তাঁর মতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা সমাজে অতিরিক্ত প্রাধান্য পাচ্ছে, যা তাদের পাওয়া উচিত নয়; সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানের ক্রিয়াকাণ্ড চলাও উচিত নয়। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও সরকারি ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা উচিত।

একটানা এতগুলি কথা বলে রহমান থামতেই কৃষ্ণ উত্তেজিতভাবে বলে—এ সেই নতুন বোতলে পুরনো মদ। মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান—এটা যারা অস্বীকার করে তারা বরাবর একথা বলে আসছে। বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে পৃথক করো, সর্বত্র বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমদানির আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। বিজ্ঞানদা দুজনকেই শান্ত করতে চান—থামো, তোমরা। রহমানের কথা উড়িয়ে দেবার নয়। তোমাদের পত্রিকাতেই কিছুদিন আগে—ঠিক সংখ্যাটা আমার মনে নেই—একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল না, 'বিজ্ঞানের অন্য এক ছবি' বা ঐরকম কিছু একটা?

—হ্যাঁ, মার্চ-প্রপ্রিল 1985 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে "বিজ্ঞানের ইতিহাস: অন্য ছবি"—গড় গড় করে বলে রহমান।

বিজ্ঞানদা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। তা সেই প্রবন্ধেও তো টমাস কুনের "দি স্ট্রাকচার অফ সায়েন্টিফিক রেভোল্যুশনস" বই-এর প্রসঙ্গ টেনে আলোচিত হয়েছিল যে বিজ্ঞানের আজকের যেটা প্রতিষ্ঠিত চেহারা, বিজ্ঞান সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক—তার বিকল্প খোঁজার মশলা আছে বিজ্ঞানের ইতিহাসেই। আমিও তো সেই কথাটাই বলার চেষ্টা করছি যে বিজ্ঞান সম্পর্কে চালু দৃষ্টিভঙ্গীটা অসম্পূর্ণ, অমানবিক। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তা কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে?

রহমানের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়—আমি তো সেই প্রশ্নই তুলে ধরছি। একটু আগে যা বলেছিলাম তা আরও একটু স্পষ্ট করে বলি—আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে রূপরেখা দিলেন—অভিজ্ঞতা-প্রকল্প-পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-তত্ত্ব এদের মধ্যে সম্পর্কটা যতটা সরাসরি ও যৌক্তিক বলে দাবী করা হয়, এখন বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এবং দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষও নয় ব্যাপারগুলি। সবচেয়ে সরল, সুন্দর একমাত্র সম্ভাব্য তত্ত্বটা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়, একথাও ঠিক নয়। কারণ, প্রথমত প্রকল্প রচনায়, পরীক্ষা-পরিকল্পনায়, সিদ্ধান্ত-গ্রহণে বা তত্ত্ব-প্রণয়নে ব্যক্তি বিজ্ঞানীর যুক্তিবিচার সম্পন্ন হয় তার অস্তিত্বের, মানস-লোকের কত যে আলো-আঁধারি পেরিয়ে, কত যে অজানা উৎস থেকে প্রাণ-রস সংগ্রহ ক'রে, তার খোঁজ কে রাখে? আধুনিক বিজ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রেও তো এটা স্বীকৃত যে পরীক্ষার বিষয় ও বিষয়ী অন্যনিরপেক্ষ নয়, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপারও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশ কালের চলতি হাওয়া সব যুক্তিকে গ্রাহ্য করে না। সহজ সাধারণ যুক্তিও অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। বিজ্ঞানে এমনটি বহুবার হয়েছে, আর সেটাই স্বাভাবিক, কারণ বিজ্ঞানীরা গোষ্ঠীবদ্ধ এবং তাঁরা স্বীকৃতিও চান। উপরোক্ত প্রবন্ধে একটা খুব ভালো উদাহরণ ছিল—টর্চের আলোপড়া ছোট্ট জায়গাটুকুতেই চলে খোঁজাখুঁজি! তৃতীয়ত, এ থেকেই স্পষ্ট যে চালু বা স্বীকৃত তত্ত্ব বিকল্পবিহীন নয়। কাজেই আমি বলব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে সুনির্দিষ্ট একক পদ্ধতির কথা বলা হ'ল বিজ্ঞানকে বদ্ধ করা—গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা। আর বিশেষ ভাবে একথা সত্য যখন বিজ্ঞানকে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে মানব-সংস্কৃতির অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়।

—একথা অস্বীকার করা যায় না যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সর্বদা আমাদের আলোচিত পদ্ধতির পথ চেয়ে হয়নি,—বিজ্ঞানদার গলা যেন বা একটু নিস্তেজ—ফেইরাবেণ্ডের বইটা আমিও পড়েছি। তিনি একজন নীতিনিষ্ঠ সমালোচক। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে একেবারে নস্যাৎ করেননি। যেমন ভূমিকায় তিনি এক জায়গায় বলেছেন, একই সঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতির অস্তিত্ব সঠিক পথে জ্ঞানের বিকাশে চমৎকার দাওয়াই। অন্যত্র এক জায়গায় বলেছেন, নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিজ্ঞানের সাফল্যও অনেক সময় অনিয়মের, বিশৃঙ্খলার উপর নির্ভরশীল। আসলে তিনি স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের স্বার্থে কিছু সঠিক সমালোচনা করেছেন; যেমন বিভিন্ন মতামতের বা পদ্ধতির অবাধ উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা, বা বিজ্ঞানের নামে গোঁড়ামি বা অত্যাচার বন্ধের প্রয়োজনিয়তা। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের নামে যে ইউনিফর্মটির কথা বলা হয়, তা বিজ্ঞানের সমালোচনার শক্তিকে খর্ব করেছে। গালাগালি দিয়ে বা দূরে সরিয়ে রেখে এ প্রশ্নগুলিকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। মার্কসবাদ যখন গোঁড়ামি হয়, বা বিজ্ঞান হয়ে ওঠে কুসংস্কার, তখন তাদের ক্ষতিকারক প্রভাব ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।...কিন্তু ফেইরাবেণ্ড মাঝে মাঝে জ্বলে উঠে যখন বলেন, যে পদ্ধতিগত কোন নিয়ম নয়, নিয়মের নৈরাজ্যই কাম্য তখন আমি মোটেই একমত হতে পারি না,—বিজ্ঞানদার গলায় আবার প্রত্যয় ধ্বনিত হয়—বিজ্ঞান যদি হয় লক্ষ্য আর পদ্ধতি যদি হয় তা সাধনের উপায়, তবে একই লক্ষ্য সাধনের বহু উপায় থাকলেও, বৈজ্ঞানিক উপায় সেটি বা সেইগুলি যেটি বা যেগুলি প্রকৃতি ও সমাজের স্ফূরণে ও সামঞ্জস্য-বিধানে সবচেয়ে বেশী সহায়ক ও সবচেয়ে মানবিক। আমার মনে হয়, পদ্ধতি সম্পর্কে যেটুকু হদিস আমাদের জানা আছে তাকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ধরে বিজ্ঞানে তো বটেই, সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করা যায়। তবে কুন, বা লাকাতো বা ফেইরাবেণ্ডদের মত সমালোচকদের কথা মনে রেখে, খেয়াল রাখতে হবে যাতে তা সর্বদা ব্যক্তিসত্তা, প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সৃজনাত্মক সম্পর্কে যুক্ত থাকে। —অর্থাৎ যুগপৎ নিয়মের অধীন হওয়া ও খোলামেলা থাকা—একটি অভীপ্সা তথা সদিচ্ছা বা সোনার পাথর বাটি—রহমান ব্যঙ্গ করে ওঠে।

—তোমার কাছে যদি তাই মনে হয় তো তাই, তবে সকলের তা মনে নাও হ'তে পারে। বিজ্ঞানদা ইতি টানেন। □

।। ভারতীয় প্রযুক্তি পরিস্থিতি : যুক্তি, তর্ক ও আশা-নিরাশা ।।

সুব্রত ভট্টাচার্য

কোনো বামপন্থী নেতার মুখে নয়, কথাগুলো এবার শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রযুক্তি-বিষয়ক মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী সত্যেন 'শ্যাম' পিত্রোদার কণ্ঠে! কেন্দ্রীয় প্রশাসনের এত কাছাকাছি একজন মানুষের কাছ থেকে এ রকম নির্ভীক সত্যোচ্চারণ আমাদের স্বাভাবিক-ভাবেই ভীষণ বিস্মিত করে এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সন্দেহ জাগায়। এ সব জটিলতায় না গিয়েও একটা কথা বলা যায় যে গত 8 মার্চ 1988-তে খড়্গপুর আই. আই. টি.'র সমাবর্তন ভাষণে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ক মূল্যায়নে শ্রী সত্যেন 'শ্যাম' পিত্রোদার ভাষণের মূল সুর 'বি-ও-বি'র গত দশ বছরের পর্যবেক্ষণ ও প্রচারের প্রতিধ্বনি মনে হওয়া বিচিত্র নয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তা এতটাই যে পিত্রোদাজীকে আমাদের অনেকেরই সে বিচারে 'শ্যাম'—সমান (!) মনে হতে পারে। কিন্তু, কারণ অনুসন্ধানে ও সমস্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি যে মডেল স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, তা বিতর্কমূলক এবং হয়তো কিছুটা ক্ষতিকরও। সে বিষয়ে আমরা পরে সামান্য আলোচনা ক'রবো।

সূচীমুখী দুটি প্রশ্ন সেদিনে তিনি খুব জোরালোভাবেই উপস্থিত করেছেন—যা 'বি-ও-বি'ও ক'রে আসছে গত দশ বছর ধরে। তা হ'ল : সত্যি কতদূর অগ্রসর হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা? আর যতটুকু যা হ'য়েছে তার ফলটুকুই বা কতদূর প্রসারিত করা গিয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে? খুব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বা শোদা চাখে তাকালে এ দুটি প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক হ'তে বাধ্য। এবং তাই হ'য়েছে পিত্রোদাজীর দৃষ্টিতেও।

অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা : আসল চেহারা

হ্যাঁ ঠিকই, সংখ্যার অঙ্কে বিচার করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নিযুক্ত বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা এদেশে দুটি বৃহৎ শক্তির পরেই। কাজেই সংখ্যাকারে তা মোটেই জীর্ণশীর্ণ নয়—বরং বেশ হৃষ্টপুষ্টই। কিন্তু মৌলিক আবিষ্কার সংখ্যা, তার উদ্ভাবনী-প্রয়োগ, গবেষণার সার্বিক গুণগত মান এবং প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতার প্রশ্নে ভারতীয় সাফল্যের মাত্রা? নিঃসন্দেহে কোনো ক্ষেত্রেই তা প্রশ্নাতীত তো নয়ই, এমন কি সন্তোষজনকও নয় বলে জানিয়েছেন পিত্রোদা। পরিস্থিতির কী অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য! একদিকে, বিদেশী মডেলের সার্থক অনুকরণে আমরা ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাই, শূন্যে মহাকাশযান পাঠানোর চেষ্টা করি, আকাশে সফল রকেট উৎক্ষেপণ করি, এবং করি অ্যান্টার্কটিকা-অভি-যান একের পর এক ; শুধু তাই নয়, একবিংশতি শতাব্দীর আহ্বানে মাত্রা-ছাড়া বাড়িয়ে যাই কম্প্যুটারের তর্জন-গর্জন……আর তখনই, ঠিক তখনই, অন্য দিকে, পাশাপাশি চলে ডাকঘরে ব্যবহার্য সামান্য আঠাও বিদেশ থেকে আমদানী এবং তা বছরের পর বছর ধরে, আর তা হাজার-হাজার প্রযুক্তিবিদ ও রসায়ন-বিশেষজ্ঞ দেশে মজুত থাকা সত্ত্বেও! ভাবা যায়! পিত্রোদাজী আক্ষেপ ক'রে বলেছেন যে শুধু আঠা নয়—বিদেশ থেকে আনতে হয় এরকম ছোটখাট আরো অনেক অতি-সাধারণ সামগ্রী ; যা অত্যন্ত গ্লানিকর। যে বিদেশী মুদ্রার অপচয়-বনাম-সাশ্রয় নিয়ে দেশে এত কথা শোনা যায় সেখানে জেনেশুনে বছরের পর বছর কীভাবে যে এটা ভুলে-থাকা-যায় সেইটেই রহস্য ও বিস্ময়! খুব ঠিক কথা বলেছেন 'শ্যাম' পিত্রোদাজী যে জ্ঞানের চর্চা এবং দেশের কর্মকাণ্ডে তার অর্থপূর্ণ প্রয়োগ, এ দুয়ের মধ্যে কোঁথাও একটা মস্ত ফাঁক রয়ে গিয়েছে……কিন্তু কোথায়? (আমাদের প্রশ্ন)।

বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক ব্যাখ্যা?

ফাঁকপূরণের ব্যাখ্যায় তিনি 'বৈশ্যবিজ্ঞান' ও 'শূদ্রবিজ্ঞান' নামের যে দুটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, আমাদের প্রবল আশঙ্কা, তা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে চরম ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্পর্কে, খুব সংগত ও স্বাভাবিকভাবেই, জনমানসে একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েই আছে এবং বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যেও একটা চাপা বিরূপতা (tension) সব সময়ই রয়ে গিয়েছে—তার কারণ থাকুক-চাই-নাই-থাকুক। এ রকম পরিস্থিতিতে এ ধরনের প্রসঙ্গ উত্থাপন আদৌ বাঞ্ছনীয় কিনা সেইটেই বিচার্য। তাছাড়া, এ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সাদৃশ্য-ভিত্তিতে ঘটনার সত্যি কোনো গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা সেটাও আলাদাভাবে ভেবে দেখার বিষয় [যদিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত আংশিক রিপোর্টের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে এখনই কোনো চূড়ান্ত মতামত দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাই তা দেওয়া হচ্ছেও না]।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য প্রযুক্তি-উপদেষ্টার মুখ-নিঃসৃত কিছু উল্লেখযোগ্য উক্তি আমরা এখানে সংবাদপত্র থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি—"There are a large number of import lobbyists in Delhi, who push technologies which India could have developed herself. The country's industrial products are costlier and inferior to those manufactured abroad. The Government has too many programmes and as many priorities and would like to build more institutions than maintain the existing ones properly. These were some of the instances of the country's present technological scene." [সূত্র : The Statesman, Calcutta edition, 9 March 1988, p. 3] সাবাস, আপাতত 'টু চিয়ার্স্ ফর' 'শ্যাম' পিত্রোদা। কিন্তু সমাবর্তন বক্তৃতার ফুলঝুরি যেন অচিরেই মিলিয়ে না যায়,

স্যাম পিত্রোদাজী, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি-নীতি-প্রণয়ন ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় যেন সংশোধনের লক্ষণগুলো অন্তত স্থান পায় অগ্রাধিকারের সমস্যাসমূহের বিবেচনায়। তবেই না বলা যাবে 'থি চিয়ারস্' এবং স্যাম পিত্রোদাজীকে ভারতীয় সফল প্রযুক্তি পরিকল্পনার যোগ্যতম শল্য চিকিৎসক।

অব্যাহত ব্রেনড্রেন ?

খড়্গপুর আই.আই.টি.'র চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রী রুশি মোদি সেদিন তাঁর ভাষণে ছাত্রছাত্রীদের বিবেচনাহীনভাবে বিদেশযাত্রার ওপর প্রস্তাবিত কিছু বিধি-নিষেধ আরোপের সম্ভাবনার কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আই.আই.টি.-গুলি থেকে একজন এঞ্জিনিয়র বা মেডিকেল কলেজ থেকে একজন ডাক্তার তৈরির পেছনে দেশ ব্যয় করে মাথাপিছু লক্ষাধিক টাকা—যে টাকার সিংহভাগই আসে সরকারী কর সংগ্রহ থেকে অর্থাৎ যে টাকা সম্পূর্ণভাবেই মূলত ভারতীয় জনগণের। অথচ, পাশ ক'রে বেরোনোর পর দেশবাসীকে তাঁদের (অর্থাৎ সেইসব এঞ্জিনিয়র বা ডাক্তারদের) প্রদেয় প্রতিদান ব্যবস্থা কিছু থাকবে না আবশ্যিক ভিত্তিতে? আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে এ ধরনের বিলাসিতা আর কতদিন মানানসই? শ্রী মোদি বলেছেন—"In a free country an individual should be free to pursue his career." ভালো যুক্তি! ঋণ করবার অধিকার থাকবে আর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব থাকবে না? এটা কীভাবে সম্ভব? এ প্রশ্নটিকে নিছক ব্যক্তি-স্বাধীনতার ছক দিয়ে পাশ-কাটানো যায় কিনা সেটাই আমাদের মূল প্রশ্ন এখানে [বারান্তরে, এ প্রসঙ্গে আরো কিছুটা বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইল]।

বৈজ্ঞানিকতা ও আঞ্চলিকতাবাদ

কিন্তু একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অভাববোধের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা সামগ্রিকভাবে শিক্ষাদর্শনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তিনি বলেছেন—"The Country has millions of Hindus, millions of Muslims, and millions of Sikhs, but few Indians." [সূত্র: ঐ] খুবই সঠিক এবং অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ এটি। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলির ভূমিকাও অত্যন্ত নিন্দনীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাবাদ ও দলবাজি যে তীব্র আকারে রয়েছে সে তো কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অতি ছোটখাট সংবাদপত্রীয় প্রচারের মধ্যেও সজ্ঞানে (?) কীভাবে আঞ্চলিকতাবাদের উপাদান রেখে দেওয়া হয় তার কয়েকটি উদাহরণ আমরা হালে দেখেছি। অতি সম্প্রতি কলকাতায় কর্মরত তিনজন বিজ্ঞানকর্মীর কৃতিত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজের প্রচারে নামতে গিয়ে কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকের শিরোনামে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হ'ল তিন 'বাঙ্গালী' (শুধু বাঙ্গালী?) বিজ্ঞানী হিসেবে—ভুলেও একবার গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হ'ল না যে তাঁরা 'ভারতীয়'। 'সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক'ই যদি এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন সেন্টিমেন্ট-এর কারবারি হয়ে ওঠে তাহলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ প্রচার-বিভ্রান্ত হলে তাকে খুব দোষারোপ করা যায় কি? আর, কবে বা কীভাবে যে এসব দুরারোগ্য ব্যাধির বিনাশ ঘটবে তার উত্তর, বোধ করি, একমাত্র ইতিহাসই জানে।

আশা-নিরাশা

সব মিলিয়ে বিচার করলে প্রযুক্তি-পরিস্থিতি কার্যত এখনও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক—বিপরীত সুরের ঢক্কানিনাদ কাগজে-পত্রে যতই ছাপানো হোক। আর, অগ্রগতির সঠিক অভিমুখ সম্পর্কে সরকারি কর্তাব্যক্তিরা নিজেরাই কিছুটা সমালোচনামুখর—স্যাম পিত্রোদার স্বীকারোক্তির গুরুত্ব নিহিত এখানেই এবং সেটাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আশার একমাত্র রুপোলী রেখা। □

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র
দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে
জনৈক শুভার্থীর
অভিনন্দন

আর্সেনিকে আক্রান্ত অশোকনগর

একটি সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক আর্সেনিক দূষণের উৎস ও কারণ এখনো আবিষ্কৃত হলো না। এদিকে দূষণ-আক্রান্ত এলাকায় দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকানোর উপযুক্ত কোনোরকম ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে না, আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসার কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না। সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হচ্ছেন ক্ষেতমজুর, গরীব মানুষেরা। —একটি প্রতিবেদন।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ অংশ আর্সেনিক-দুষ্ট। প্রধানত পানীয় জলের মাধ্যমেই এই আর্সেনিক সংক্রামিত হচ্ছে। মানুষের শরীরে এর প্রভাব বিপজ্জনক। উল্লেখ্য যে উত্তর 24-পরগণার অশোকনগর ও সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলগুলিও এই আর্সেনিকের আক্রমণ-মুক্ত নয়। বরং ভয়াবহতায় এই অঞ্চলটি পশ্চিম-বঙ্গে অগ্রগণ্য।

সম্প্রতি অশোকনগর সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসিও-কালচারাল ফোরাম-এর পক্ষ থেকে এক ব্যাপক অনুসন্ধান এই অঞ্চলগুলিতে চালানো হয়। সমীক্ষায় চিন্তিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ভয়াবহ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। কচুয়া সংলগ্ন (অশোকনগর স্টেট জেনারেল হসপিটাল-এর পিছনে) বিনিময়পাড়ায় মোট 47টি পরিবারের 221 জন ব্যক্তি বসবাস করেন। এর মধ্যে 22টি পরিবারের 116 জন ব্যক্তি আর্সেনিক-দুষ্ট পানীয় জল পান করে কমবেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে 40 জনের আশু চিকিৎসার প্রয়োজন। 5 জনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। বিনিময়পাড়ার ব্যক্তিগত মালিকানার টিউবয়েলের জল পরীক্ষায় দেখা যায় সব কয়টিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। পরবর্ত্তী কালে সরকারী ব্যবস্থায় 5টি টিউবয়েল বসানো হয়। যদিও এই সংখ্যাটি জন-সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে এই অঞ্চলের জনসাধারণ এখনো আর্সেনিক-দুষ্ট টিউবয়েলের জল ব্যবহার করে যাচ্ছেন। এই অঞ্চলের আর্সেনিকযুক্ত টিউবয়েলগুলি 100-150 ফিট গভীর। সরকারী 5টি টিউবয়েলের জলে এ যাবৎ কোন পরীক্ষা হয় নি। ফলে তাতেও আর্সেনিকের আশঙ্কা থেকে যায়। আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎ-সার চিত্রটি আরো করুণ। বহু রোগী হয় "ওষুধ পাওয়া যায় না", নয় "এর চিকিৎসা সম্ভব নয়"—এরকম ধারণা পোষণ করেন। দীর্ঘদিন ঘোরা-ঘুরির পর অনেকেই 'ট্রপিক্যাল' থেকে ফিরে এসেছেন। খোলা বাজার এবং হাসপাতালগুলিতে ওষুধের অভাব এঁদের হতাশ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

শুধু বিনিময়পাড়া নয়, দৌলতপুর উত্তর ও দক্ষিণেও আর্সেনিকের ভয়াবহতা ধরা পড়ে। দৌলতপুর দক্ষিণে 21টি পরিবারে 121 জনের বসবাস। এর মধ্যে 7টি পরিবারে 23 জন আক্রান্ত। এঁদের মধ্যে মাত্র তিনজনের 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে' কিছুদিন চিকিৎসা চলে। তাও নিরাময়ের পূর্বেই ওষুধের অভাবে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের সমস্ত টিউবয়েলের জল আর্সেনিক যুক্ত। আপাতত 4টি সরকারী কল এদের পানীয় জল যোগাচ্ছে। দৌলতপুর উত্তরের আংশিক সমীক্ষায় 10 জনের শরীরে আর্সেনিক ধরা পড়েছে। এঁদের সকলের অবস্থা গুরুতর। চিকিৎসার অভাবে প্রত্যেকেই ক্রমশ গভীরতর বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন।

অশোকনগর কল্যাণগড় মিউনিসিপ্যাল এলাকার এক নং স্কীমের ছয় নং ওয়ার্ডের এক অংশে 49টি টিউবয়েলের মধ্যে 39টি টিউবয়েল আর্সেনিক-দুষ্ট। যদিও প্রতিটি কলের জলই এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অঞ্চলে ইতিমধ্যে দুই জন আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও এক নং স্কীমের কালোবাড়ী অঞ্চলে ছয় জন আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী রয়েছেন, এঁদের কারুরই এ যাবৎ কোন চিকিৎসা হয় নি। অশোক-নগরের এই অঞ্চলগুলিতে সরকারী কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এখনো পর্যন্ত হয়নি।

বিনিময়পাড়া, দৌলতপুর গ্রামের লোকেরা অধিকাংশই ক্ষেত মজুর বা অন্য কোন কায়িক শ্রমযুক্ত কর্মে রত। ফলে তাঁদের এইসব রোগ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা করার মতো পর্যাপ্ত সময় নেই। উপরন্তু অর্থের সঙ্কট এবং সামাজিক অশিক্ষা প্রভৃতি গতানুগতিক কথাগুলো প্রসঙ্গত উল্লেখ না করে উপায় থাকে না। এরই শিকার খগেন দাস নামক বিনিময়পাড়ার জনৈক ক্ষেতমজুর। তাঁর আর্সেনিক দুষ্ট শরীরে তৈরী হয় ক্ষত। এদিকে চাঁদসী চিকিৎসার উপর আস্থা রাখতে গিয়ে তা ক্রমশ ভয়ংকর আকার ধারণ করে। পচন রোধ করবার জন্য চিত্ত-রঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে তাঁর বাঁ পা'টি বাদ দিতে হয়। খগেনের মেয়ে বাসন্তীর চিকিৎসাও সম্পূর্ণ হয়নি। 50টি ইনজেকশন নিয়ে ও চলে এসেছে। বাড়ীর সবাই একইসঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হলে সংসারে যে আরও দু'চারজন থাকে তাদের দেখবে কে? এদিকে ইনজেকশন দেবার জায়গা পেকে উঠেছে। ঘা শুকোচ্ছে না।

বাসন্তীর সমস্যার বাস্তবায়িত রূপ হ'ল দৌলতপুরের বাবুলাল তফাদারের পরিবার। সংবাদপত্রের কৃপায় বাবুলালের কথা এমনকি তার হাত-পায়ের চেহারাও সহানুভূতিশীল কলকাতার মানুষের চেনা। অথচ আজও ক্ষেতের কাদামাটির উপর দাঁড়িয়ে চারা রুয়ে দেয় বাবুলাল আর তার চার ভাই। হাত-পা ভিজে গেলে গন্ধ বেরোয়। অসাড়,

অনুভূতিহীন হাত থেকে চামড়া খসে পড়ে। পালা করে বাড়ীর সকলের চিকিৎসা হয় 'ট্রপিক্যালে'। অথচ অবস্থাটা এই যে যখন হাসপাতালে ওষুধ থাকে তখন তাদের ভীষণ কাজের সময় আর তারা ভর্ত্তি হতে চাইলে হয়তো তখন হাসপাতালে বিদেশ থেকে আনা ওষুধ ফুরিয়ে যায়।

দৌলতপুর উত্তরে সমীক্ষা চালানোর সময় 7 বছর আক্রান্ত 35 বছরের গৃহকর্ত্রী রীণা দাস ফুসে ওঠেন সমস্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর সারা গায়ে পুড়ে যাবার মতো অসংখ্য কালো কালো দাগ। আর্সেনিকের চিকিৎসার জন্য ট্রপিক্যালে ভর্ত্তি হন 1987 সালের আগস্ট মাসে। দু'মাস থাকার পর তাঁর ছুটি হয়ে যায় ওষুধের অভাবে। রীণা দেবীর অবিশ্বাস বস্তুত প্রশাসনের উপর; এমন কি হাসপাতালের ওপরেও তাঁর খুব একটা আস্থা নেই। এই অবিশ্বাস কতটুকু ন্যায়সঙ্গত তার বিচারে না গিয়েও বলা যায় এই অনাস্থা গড়ে ওঠাটাই তাঁদের ক্ষেত্রে সত্য।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফোরাম 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন' (অশোকনগর শাখা)-এর সভাপতি ডাঃ সাধন সেনের সাথে কথাবার্তা চালায়। আই.এম.এ. পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। স্থানীয় ডাক্তারদের সহযোগিতায় তাঁদের নিয়ে গ্রামগুলোতে যায়। কিন্তু সমস্ত চিকিৎসাটাই সরকারী বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় বেশী দূর এগোনো সম্ভব হয়নি। এদিকে পাইপের সিল ভেঙ্গে আর্সেনিকের জল ব্যবহার করতে শুরু করেছে গ্রামের মানুষ। তাদের বারণ করতে ছুটতে হয়। স্থানীয় অঞ্চল প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করেন।

এমতাবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনকে আনুপূর্বিক সমস্ত জানিয়েও বিশেষ কোন ফল হয় না। ফোরামের পক্ষ থেকে গত 23.11.87 তারিখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং Directorate of Health Service-এর কাছে স্থানীয় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আর্সেনিক-দুষ্ট রোগীদের চিকিৎসা এবং নিদেন পক্ষে একটা স্ক্রিনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয় (চিঠি নং-PA/DHS/10219 dt : 23/11/87)। এবং গত নভেম্বর '87-তে ডাঃ কে. সি. সাহার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি সরকারী ব্যবস্থায় আসতে পারেন বলে জানান। আই.এম.এ.—এই একই অনুরোধ জানিয়ে ডি. এইচ. এস.-কে চিঠি লেখেন। কিন্তু কারোর কাছেই আজ পর্যন্ত কোন উত্তর এসে পৌঁছোয়নি। প্রশাসনের এই নীরবতার ফল বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল তাহলে কি হবে? আর্সেনিক-দুষ্ট এই মানুষেরা কি ক্ষয় হতে হতে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন? না কি তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে সুষ্ঠুভাবে। অধিকাংশ রোগীই তাঁদের রোগ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। "জেনেও কি হবে"—এই ধরনের অসহায়তা কাজ করছে তাঁদের ভেতর। আর সমস্ত জেনেশুনেও আমরা নিরুপায়। সরকারী বদান্যতার উপর নির্ভরশীল। ফলে আমরা ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত হলেও আখেরে রোগীদের কোন লাভ হচ্ছে না।

আমরা চাই অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হোক। স্ক্রিনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে বাছাই চলতে পারে। পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক এবং পাশাপাশি আর্সেনিকের উৎস সম্পর্কে গবেষণা চলুক। আমরা চাই না বাবুলাল, বাসন্তীরা বিনিময়পাড়ার তারাপদ দাস, মনোতোষ সেন, হরিপদ হালদার, পরিতোষ সেনের মতো আর্সেনিক বিষে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ুক।

রাজশেখর রায়চৌধুরী
অপূর্ব সাহা

অশোকনগরে আর্সেনিক : তথ্য

গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা	বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত পরিবারের সংখ্যা	বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা	প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	আর্সেনিক যুক্ত টিউবয়েল (শতকরা)	আর্সেনিকের পরিমাণ (mg/litre) সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
বিনিময়পাড়া	47	221	22	116	3	90%	0.530	0.18
দৌলতপুর (দক্ষিণ)	21	121	7	23	7	80%	0.575	0.24
দৌলতপুর (উত্তর —আংশিক)	20	187	4	4	1	85%	0.427	0.08

[সাইন্স অ্যাণ্ড সোসিও কালচারাল ফোরাম-এর সৌজন্যে
895/1 অশোকনগর, পোঃ অশোকনগর, 24-পরগণা, পিন 743 222]

□ □ □ □ □ □

সার কারখানার বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলন
বর্তমান পরিস্থিতি

ঘন জনবসতিপূর্ণ গ্রামসমূহের মাঝে, কৃষিক্ষেত্রের উপরে সুপার ফসফেট রাসায়নিক সার ও সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতের কারখানা-স্থাপনের চেষ্টা চলছে—চেষ্টা চলছে, ব্যক্তি মুনাফার স্বার্থে লক্ষ্মীকান্তপুর তথা সমগ্র সুন্দরবনের পরিবেশ নষ্ট করার ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করার। এরই বিরুদ্ধে বিগত 16 মাস ধরে আন্দোলনরত "মন্দির বাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি"। বি-ও-বি'র বিগত সংখ্যাগুলিতে এই আন্দোলনের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে পরিবেশন করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

সংগ্রামরত "মন্দির বাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি" ভেঙে দেবার চক্রান্ত হয়েছে। এ কাজের অন্যতম পুরোধা হিসাবে মন্দির-বাজারের বি.ডি.ও. মহাশয়কে দেখা যায় বিগত সেপ্টেম্বর মাসে। সহজেই তাঁর সেই অপচেষ্টা পরাস্ত হয়। অক্টোবর মাসের 6 তারিখে স্থানীয় এম. এল.এ সুভাষ রায় সুলতানপুরে জমি মালিকদের ডেকে কোম্পানীকে জমি হস্তান্তর করতে পরামর্শ দেন কিন্তু পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে নাজেহাল হয়ে স্থান ত্যাগ করেন। 11. 10. 87 তারিখে CPI (M) দলের গাববেড়িয়া শাখা কমিটির সদস্য সমর্থক সক্রিয় কর্মীদের সভাতে প্রায় 55 জনের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত কোম্পানি SFL-কে সমর্থন করার দলীয় প্রস্তাবকে নাকচ করার দাবী ওঠে। 18. 10. 87 তারিখে SFL কর্তৃপক্ষ গাববেড়িয়া অঞ্চলপ্রধান ফাল্গুনী চৌধুরীর সাথে বৈঠক করেন। SFL-কে জমি সংগ্রহে সাহায্য করার প্রস্তাবে প্রধান মহাশয় অক্ষমতা প্রকাশ করেন—পরিবেশ আন্দোলনে রত মানুষজনের বিপক্ষে না যাবার সংকল্প ঘোষণা করেন। SFL কর্তৃক ক্রয় করা 33 বিঘা জমি সবই বিক্ষিপ্ত। তাই কারখানা প্রতিষ্ঠার কৌশল হিসাবে বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে 50 বিঘা জমির অখণ্ড একটি প্লট করে নেবার অপচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে জমি মালিকরা সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। CPI (M) দলের মুখপত্র গণশক্তিতে 19. 11. 87 তারিখে প্রকাশিত হয়, SFL তাঁদের কারখানা সুন্দরবনে না করে করবেন ত্রিপুরাতে—স্থান পরিবর্তনের জন্য অনুমতির অপেক্ষা চলছে। তখন আবার ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন। 25. 11. 87 তারিখে CPI (M) জেলা নেতৃত্ব গাববেড়িয়া, ঘাটেশ্বর (উত্তর) এবং ঘাটেশ্বর (দক্ষিণ)—এই তিন শাখা কমিটিকে নিয়ে আলোচনায় বসেন SFL প্রসঙ্গে তাঁদের কর্মসূচী নির্দ্ধারণের জন্য। পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রবল হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে সমস্ত কথা জেলা কমিটির দপ্তরে প্রেরণ করা হয় বলে শোনা যায়। 1. 12. 87 তারিখে আকাশবাণী কোলকাতা থেকে প্রচারিত গ্রামীণ সংবাদে জানা যায় SFL তাঁদের কারখানা লক্ষ্মীকান্তপুরের মাটিতে স্থাপনের চেষ্টা না করে অন্যত্র নিয়ে যাবেন। বিজয়গঞ্জ বাজারে অবস্থিত SFL site office অবলুপ্ত হতে দেখা গেল 1. 12. 87 থেকে। বিগত 3.1.88 "ভূপাল দিবস" হিসাবে পালন করেন মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি। সুদীর্ঘ সাইকেল মিছিল, আলোচনাচক্র ও পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। উচ্চ ও দৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে—লক্ষ্মীকান্ত-পুরে আর ভূপাল নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মানুষজনের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটি তাঁদের 20. 1. 88 তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা কেউ অন্তত পরিবেশ আন্দোলনকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইস্যু করবেন না। অবশ্য এ বিষয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির সাথে কমিটির কোন অফিসিয়াল সমঝোতা হয় নি—পরিস্থিতিও ছিল না তার। যাই হোক, পরিবেশ আন্দোলন ইস্যু হয়ে পড়ে। প্রথম শুরু করেন কংগ্রেস (আই) দল তাঁদের নির্বাচনী জনসভায়। পরে এস. ইউ. সি. আই. এর জবাবে বক্তব্য রাখেন। অবশ্য কমিটির অনুরোধে তাঁরা সংযমের পরিচয় রাখেন। কিন্তু সব শোভনতা ছিন্ন হয় লোকসভা সদস্য মনোরঞ্জন হাল-দারের বক্তব্যে। তাঁর অভিযোগ, এস. ইউ. সি. আই. এবং এবং সি. পি. আই.(এম.) দলের তৈরী করা কমিটি দেশের শিল্পায়নে বাধা দিচ্ছে পরিবেশ দূষণের অজুহাতে। প্রাদেশিকতার বিষাক্ত অভিযোগ এনে তিনি বলেন কমিটি অবাঙালী শিল্পপতিদের টাকায় আন্দোলন চালাচ্ছে। অজস্র অসত্য ভাষণেও তাঁর দল গাববেড়িয়া অঞ্চল পঞ্চায়েত থেকে কোন আসন পান নি। গ্রাম-পঞ্চায়েত আগের মতই এস. ইউ. সি.'র এবং পঞ্চায়ত সমিতি ও জেলা পরিষদ আগের মতই সি. পি.এমের হাতেই আছে। অর্থাৎ স্থানীয় মানুষজন মাননীয় লোকসভা সদস্যের মনোরঞ্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন সঠিক ভাবেই। বিগত 26. 3. 88তে "আজকাল" দৈনিকে হালদার মহাশয়ের SOS বার্তা আর্তনাদ হিসাবে শোনা গেল। CPI (M)-এর যুব সংগঠনকে তিনি আহ্বান জানালেন SFL প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী করে আন্দোলন করতে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে অভিযুক্ত করলেন এই বলে যে তাঁরা পরিবেশ দূষণের প্রশ্নে SFLকে অনুমোদন দেন নি। যাই হোক, এই কাতর আহ্বানেও DYF-এর তরফে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি আজো। তবে গত 3. 4. 88'র আনন্দবাজার পত্রিকাতে দেখা গেল পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বক্তব্য (উনি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)। শ্রী বসু বলেন, "জমি বেচে রোজগার এখন এক ভাল ব্যবসা হয়েছে। আইন থাকা সত্ত্বেও এরা পরিবেশের কথা ভাবছে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কথা ভাবছে না। আমরা শিল্প চাই। কিন্তু পরিবেশ নষ্ট করে যত্রতত্র কলকারখানা করতে দেওয়া হবে না।" মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারী দিয়েছেন—পয়সাওয়ালা লোকেদের

জমি কেনাবেচার খেলা বন্ধ করা হবে বলে। দক্ষিণ 24-পরগণার বিষ্ণুপুরে বার্ধক্য আবাস উদ্বোধন করতে গিয়ে কেন তিনি এই কথা বলেন—তা আমাদের জানা নেই। আমাদের জানা নেই, MP শ্রী মনোরঞ্জন হালদারের অভিযোগের জবাব এতে আছে কিনা। উত্তর পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে হয়তো।

এ দিকে SFL স্থানীয় দালালদের মারফৎ প্রচার করছেন তাঁরা অন্যত্র কারখানা বসাবেন, লক্ষ্মীকান্তপুরে আর নয়। জমি যেটুকু কেনা হয়েছিল তা বিক্রয় করে দেবেন। অবশ্য বাস্তবে এই হস্তান্তর এখনো দেখা যায় নি। আবার বর্গাচাষীদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাও চালাচ্ছেন SFL কর্তৃপক্ষ। এই পরস্পরবিরোধী আচরণ একটি শিশুর চোখকেও এড়াতে পারে না।

যাই হোক স্থানীয় মানুষজন "মন্দির বাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি"কে রক্ষা করে চলেছেন চোখের মণির মত। কমিটি প্রচার আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে চলেছেন, চলছেন। আগামী জুন মাসে "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" পালনের জন্য এখন সুসংহত ও দৃঢ় প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ পরিবেশ আন্দোলন এবং সঙ্কটগ্রস্ত এক ব্যক্তি ॥

পরিবেশ সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়টি আমাদের কাছে নতুন। বছর পনের কি বিশ হবে—প্রথম শুনি। শুনি পশ্চিমী দেশে নাকি এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন অনেকে। তখন বুঝিনি ব্যাপারটা। বুঝতে সময় লেগেছে। খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, সরষের তেল কিংবা বিদ্যুৎ সমস্যা তখন বুঝি। কিন্তু পরিবেশ সমস্যা—?

পরে বইপত্র ঘেঁটে বোঝার চেষ্টা করি। খানিক আন্দাজ মেলে। তবে ভাসা ভাসা। কিছুদিনের মধ্যেই টের পাই—অতদূরে যাওয়ার দরকার নেই। দেশের মধ্যেই ধ্বনিত হচ্ছে কথাটা। এই কলকাতাতেই—কলকাতার আশপাশেই। খড়দহ-রিষড়া-ত্রিবেণীতে, দুর্গাপুরে-আসানসোলে।

এমন কিছু কিছু জায়গায় গেছি। গেছি কৌতূহলবশতই। মাঝে মধ্যে স্থানীয় লোকেদের ডাকে। দুচার কথা বলতেও হয়েছে।—বলেছি। মাথা খাটিয়ে।—বইপত্র পড়ে।

বি-ও-বি'তে পরিবেশ দূষণ নিয়ে লেখা হয়। দূষণ বিরোধী আন্দোলনে বি-ও-বি আছে। মনে করি—আমিও আছি। ঠিক কিভাবে, তা স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল—প্রচার আন্দোলনে বি-ও-বি'র কিছু ভূমিকা আছে। সেইমত চেষ্টা চালিয়ে আসছে বি-ও-বি।

পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। আন্দোলন প্রচার-পর্বে আটকে থাকেনি।—সংঘাতের আকার নিচ্ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে। সরকারের সাথেও। এই অবস্থায় বি-ও-বি'র ভূমিকা পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন বোধ করছেন অনেকে।

দমদম এলাকার জপুরের মেকল কেমিকেলের কথা শুনে থাকবেন। এই পত্রিকার পাতাতেও দেখেছেন। সোডিয়াম বাইক্রোমেট বানায় এরা। কারখানার বর্জ্য পদার্থে আছে বিষাক্ত ক্রোমিয়াম। এই ক্রোমিয়াম চুঁইয়ে বাইরে আসছে। কারখানার লাগোয়া কিছু জলের উৎস দূষিত করছে। লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত নানাভাবে। প্রতিবিধান চেয়ে আবেদন নিবেদন করেছেন। বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দূষণ বন্ধ হয়নি। বিবাদ অবশেষে হাইকোর্টে গড়িয়েছে।

বি-ও-বি'র বন্ধুরা জেনেছেন এ খবর। কারখানা চত্বর দেখে এসেছেন। আশপাশের এলাকাও। সেখানকার জলের নমুনা নিয়ে এসেছেন। পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে জলে ক্রোমিয়াম মাত্রা বিপদসীমার ওপরে। স্বাভাবিকভাবেই বি-ও-বি'র সহানুভূতি গেছে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে।

আরো ঘটনা ঘটেছে। সুন্দরবন এলাকায় একটি রাসায়নিক সার কারখানা বসার কথা চলছিল। সেখানকান লোকজন আপত্তি জানায়—দূষণের কথা ভেবে। বি-ও-বি'র বন্ধুদের গোচরে আসে এ খবর। সায় দেয় এই প্রতিবাদী লোকজনদের পক্ষে। সুন্দরবনের ভৌগলিক পারিবেশিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভেবে, সেখানকার মানুষদের একান্ত প্রকৃতিনির্ভর জীবন জীবিকার কথা ভেবে।

দু'টি ক্ষেত্রেই বি-ও-বি তার এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে সাধ্যমত সহযোগিতার চেষ্টা করেছে। সেখানে বার বার গেছে। জনসভা-আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছে। স্লাইড চিত্র তুলেছে। প্রয়োজনে জল মাটির নমুনা এনে পরীক্ষা করে দিয়েছে। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছে। পত্রপত্রিকা ম্যাগাজিনে প্রচারের জন্য যোগাযোগ করেছে।

ইতিমধ্যে দু'জায়গাতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। কারখানার মালিক ছাড়াও দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চলছে পুলিশী ঝামেলাও। এদিকে কোর্টের নির্দেশে সরকারী কর্তৃপক্ষ জলে ক্রোমিয়ামের মাত্রা নির্ধারণ করে রিপোর্ট দিয়েছে। তাতে ক্রোমিয়াম মাত্রা আমাদের পরীক্ষায় পাওয়া মাত্রার চেয়ে কম। আদালত সরকারী রিপোর্ট ছাড়া অন্য কারো রিপোর্ট গ্রাহ্য করছেন না। আবেদনকারী বেকায়দায় পড়েছেন। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

বদলের। তাঁরা এ নিয়ে ভাবছেন।

জের বি-ও-বি'তেও এসে পড়েছে। অনেকে মনে করছেন বি-ও-বি'র আরেকটু সক্রিয় হওয়া দরকার। দরকার আন্দোলনকারীদের পক্ষে আরো সোচ্চার হওয়া। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা মরিয়া। কারখানা বন্ধের দাবীও উঠতে পারে।

বি-ও-বি'র সাপ্তাহিক বৈঠকে এ নিয়ে কথা উঠেছিল প্রশ্ন—বি-ও-বি কদ্দূর যেতে পারে বা যাবে? কারখানা বন্ধের মত দাবীতেও সোচ্চার হবে কি? হাইপোথেটিকাল ভাবনা। তবু আপত্তি উঠেছে। মনে করে দিয়েছেন—বি-ও-বি'র এক্তিয়ারের কথা। কেউ কেউ বি-ও-বি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। আমি নিজে মত প্রকাশে বিরত থেকেছি। চুপ করে থাকা 'বিবেচনা' মনে করে।

সকলে এ যুক্তি মেনে নিতে পারেন নি। সময়াভাবে আলোচনা বেশীদূর গড়ায়নি। অমীমাংসিত থেকেছে বিতর্ক। ফলে অস্বস্তি রয়েই গেছে। আবারো হয়তো আলোচনা হবে। বিতর্ক চলবে। এবং আমি চুপ করে থাকা 'বিবেচনা' মনে করব। কেন—সে কথাটাই বলি।

জপুরের কথাটাই ধরা যাক। এমন একটি কারখানায় গেলে প্রায়শই যে খট্‌কায় পড়তে হয় এখানেও পড়েছি। কারখানার উৎপাতে আশ-পাশের লোকের বেহাল অবস্থা। ভেবেছি কারখানার মধ্যে যাঁরা রয়েছেন তাদের না জানি কি হাল! কত না ক্ষেপে আছেন তাঁরা? ভেতরে গিয়ে দেখেছি অন্য চিত্র। জঘন্য পরিবেশে কাজ করছেন ঠিকই। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করেছি—'এখানে কাজ করে আপনাদের শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে না?' বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর পেয়েছি—'না'। মেকল কেমিকেলেও ব্যতিক্রম দেখিনি। প্রশ্ন জেগেছে মনে—নিছক অজ্ঞতার কারণেই একথা বলছে, না কি অসত্য বলছে?

খট্‌কা আরো দৃঢ় হয়েছে নিজের কথা ভেবে। দূষণ নিয়ে এত 'উদ্বেগ' দেখে। ভেবেছি সেটাই বা কেন? বিশেষ করে যার বিপদ সে-ই যখন বুঝতে নারাজ! উত্তর খুঁজতে নানা কথা ভেবেছি। স্বাভাবিক কারণেই দুজনের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে হয়েছে। অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য মানে—ভৌগোলিক এবং বিত্তগত দুই অর্থেই।

বুঝেছি উত্তর এখানেই রয়েছে। দূষণের শতেক বিপদ বুঝলেও স্বীকার করায় বিস্তর অসুবিধে ওর। যেটা আমার নেই। ওর বিপদ মানে রুটি রুজির প্রশ্ন। কারখানার সাথে নড়বড়ে সুতোয় ঝুলছে ওর অস্তিত্ব। সর্বদাই আশঙ্কা এই বুঝি সুতো ছেঁড়ে। আর স্বাস্থ্য বা সুস্থ-তার বোধ? অস্তিত্ব রক্ষার টানা-হ্যাঁচ্‌ড়ায় এতই ব্যতিব্যস্ত সে, যে তার স্বাস্থ্যরক্ষার 'বোধ' কোন অতলে থিতিয়ে আছে সে নিজেই জানে না। তাকে জাগিয়ে তোলা বাইরে থেকে মামুলি কিছু বুলির কম্ম নয়।

অথচ উচ্ছ্বাসবশত প্রায়ই ভুলে যাই সেকথা। এমন অনেকবার হয়েছে—এমন 'অ-বোধ' আচরণে বিরক্ত হয়েছি। 'বোধে'র অগম্য ঠেকেছে এমন নির্বুদ্ধিতা। হতাশ বোধ করেছি।

আসলে মানুষের প্রয়োজনের 'বোধ' 'বিষয়' 'গুরুত্ব' 'অগ্রাধিকার' বিত্তগত অবস্থানভেদে ভিন্ন হয়। পরিবর্তিত হয় অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে।—ধীরে এবং অলক্ষ্যে। ফলে পরিবর্তনপর্বের অসংগতি নজরে পড়ে না। অচেনা ঠেকেনা পরিবর্তিত অবস্থান—পরিবর্তিত 'বোধ'। ঠিক যেমন অস্বাভাবিক ঠেকতনা পরিবর্তন-পূর্ব অবস্থান—সেই 'বোধ'। ফলে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানের 'বোধ' বা 'অ-বোধ' বুদ্ধির অগম্য ঠেকতেই পারে। আমার যেমনটি হয় প্রায়শই।

ছোটখাট কারখানার লোকজন যে পরিবেশে কাজ করে, দেখলেই বোঝা যায় নেহাৎ প্রাণের দায়ে করে। তাদের কাছে শালপাতায় খাওয়ার চেয়ে স্টীলের বাসনে খাওয়া কতখানি স্বাস্থ্যকর এই বিতর্ক অবাস্তব ঠেকতেই পারে। স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের উদ্বেগে সায় না দিতেই পারে। আসলে তার সমস্যার স্তরটাই ভিন্ন। সেটা আট্‌কে আছে অস্তিত্ব রক্ষার আরো গোড়ার ধাপে।

সে বিচারে আমার অবস্থান ভিন্ন।—অনেক 'সেফ' জায়গায় দাঁড়িয়ে। আমার প্রয়োজনের বোধ-বিষয়-গুরুত্ব-অগ্রাধিকার ভিন্ন। 'সুস্থ জীবন' নিয়ে দু'কথা ভাবতে পারি। বলতে পারি। জানি—গ্যাস, ধোঁয়া ধুলো, অ্যাসিড বাষ্প, অহেতুক শব্দ, ইত্যাদি আমার নিশ্চিন্ত সুস্থ জীবনের পথে অন্তরায়। ফলে এমন আন্দোলন—এই আন্দোলন আমার স্বপ্নের অনুসারী। আমি তাই এতে আছি। থাকতে পারছি। জীবনধারণের গুণগত মান নিয়ে কথা বলছি। আর এটুকু বলায় আমার ঝুঁকি সামান্যই। এইসব আন্দোলনের ফলে বড় জোর জিনিস পত্রের দাম একটু বাড়বে। কারণ উপায়ন্তর না দেখলে মালিক এবং মালিকেরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেবে। বা নেবার ভাঁওতা দেবে। যন্ত্রপাতি কিনবে, বসাবে। মোদ্দা কথা অর্থ ব্যয় হবে। মুনাফার ভাগ থেকে এই ব্যয় করবে—ভাবার কারণ নেই। দায় বর্তাবে গরীব বড়লোক সবার ঘাড়েই। মাথাপিছু হিসেবে আমার ওপরও। আমার 'রিস্ক' ওইটুকুই। তাও ভাবিনা। ভরসা আছে—'ডি. এ.' র আন্দোলন তো রইলই। সুযোগমত নেমে পড়া—

জপুর কারখানার কথায় ফিরে আসি। যত উৎসাহ নিয়েই যাই না সেদিন, ভেতরে গিয়ে লোকগুলো এবং তাদের কাজের পরিবেশ দেখে বেশ দমেই গিয়েছিলাম। সংকোচ বোধ করেছি দূষণ নিয়ে 'দুর্ভাবনা' প্রকাশ করতে। একটু আড়ালে থাকারই চেষ্টা করি। মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে কারখানা গেটের বাইরে এসে। ফের শুরু করি দূষণ নিয়ে কথাবার্তা। তবুও কারখানা বন্ধের কথা উঠলে মনের খট্‌কা যায় না। কারখানার আশপাশের লোকেদের জন্য 'উদ্বেগ' বোধ করছি। যে কেউ করবেন।—সঙ্গত কারণেই। কিন্তু কারখানার লোকগুলো? তাদের জন্য হৃদয়বৃত্তির কোন ভাবটি গচ্ছিত রাখব—ভেবে পাইনা! তাই মত প্রকাশে দ্বিধাবোধ করি। বিশেষ করে স্বার্থগত অবস্থানের ভিন্ন কোটিতে দাঁড়িয়ে যখন। তাই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হলে—চুপ করে থাকা 'বিবেচনা' মনে করি।—নিজের অবস্থানগত সুবিধে এবং / বা অসুবিধের কারণেই!

□ র. চ.

তারাপুর—কিছু বাস্তব সমস্যা

[ভারতের অ্যান্টি-নিউক গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা ধীরেন্দ্র শর্মার '83 সালে প্রকাশিত বই 'India's Nuclear Estate'। ভারতের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। নিচের অংশটি তাঁর সেই বই-এর তৃতীয় পরিচ্ছদের ভাবানুবাদ। প্রথম আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দুটি প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ-এপ্রিল 1987 আর সেপ্টে-ডিসে 1987 সংখ্যা দুটিতে।]

আরব সাগরের তীরে হুল্লোড় আর প্রাণে ভরপুর জেলেপাড়া—তারাপুর। ষাট সালের মাঝামাঝি থেকে পাড়াটা কেমন বদলে যেতে থাকে। কারণ তখন সেখানে গড়ে উঠছে এশিয়ার প্রথম পরমাণু-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। অবশেষে অনেক দিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল উনসত্তরের এপ্রিলে। ভারতের প্রথম পরমাণু-কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করল। কিন্তু হায়, শুরু থেকেই ঝামেলা! তারাপুর অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন—সংক্ষেপে-TAPS-এর ঝামেলার যেন শেষ নেই। আদ্যিকালের প্রযুক্তি আর নকশার গণ্ডগোলে ঝঞ্ঝাট দিন দিন বেড়েই চলে।

'63 সালের ভারত-আমেরিকা পরমাণু চুক্তির মধ্য দিয়ে তারাপুরের সমস্ত ভার আমেরিকার কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি জীবনভর জ্বালানী সরবরাহের দায়িত্বও। কারণ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম এনরিচ করার ব্যবস্থা আমাদের দেশে ছিল না। DAE তার জন্মলগ্ন থেকেই বলে আসছে, দেশকে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই চুক্তির বিভিন্ন শর্ত দেখলে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা আমাদের দেশের আছে বলে মনে হয় না।

সবই গণেশের কৃপা!

পরীক্ষামূলক পর্যায়ের একটা রিঅ্যাক্টর খুঁজেপেতে আনার পেছনে উদ্দেশ্য যাই থাকুক সুবুদ্ধির পরিচয় ছিল না। আর্থিক দণ্ড ছাড়াও পরিবেশের বিপর্যয়ের কথা ভাবা হয়নি। তারাপুরের পরিকল্পনা তৈরী থেকে তা রূপায়নের গোটা দায়িত্ব ছিল আমেরিকারই এক কোম্পানী IGEC-র উপর। কিন্তু নির্মিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের থেকে কখনই নির্ধারিত মাত্রায় উৎপাদন সম্ভব হয়নি। DAE-র '77-'78-এর বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সে সময়ে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 300-টি মেরামতের দরকার পড়েছিল। অবশ্য "তারাপুর" DAE-র পক্ষে একটি ভীষণ দুর্বল ক্ষতস্থান, কাজেই এ সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। '80 সালের গোড়াতে PTI তারাপুরে এক বিপজ্জনক লিক্-এর খবর প্রকাশ করে, কিন্তু DAE তা বিলকুল অস্বীকার করে। পরে অবশ্য তারা এই খবরকে সত্যি বলে মানতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাদের মতে এটা ছিল নিতান্তই মামুলি এক দুর্ঘটনা। অথচ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের চত্বরে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বিপদ সীমার উপরে থাকে। (অবশ্য এই 'বিপদ সীমা' নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই, কারণ যে কোন মাত্রার তেজস্ক্রিয়তাই ক্ষতিকর, এ কথা আজ প্রমাণিত)। আর সেখান থেকে 40-50 কিলোমিটার দূরেও তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রমাণ রয়েছে। এখানকার কর্মীরা মাঝে মধ্যেই বিপজ্জনক মাত্রার দূষণের শিকার হন। '72 সালের এমনই এক দুর্ঘটনায় দু'জন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার মারা গিয়েছিলেন। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে TAPS-এর তখনকার চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রী কোঠারী সাংঘাতিক অসুস্থ হন। বাকি জীবন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কাটিয়ে '77 সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় মারা যান। তাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যুর ইতিহাস আজও সাধারণ মানুষের কাছে সম্পূর্ণ কুয়াশাচ্ছন্ন।

কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা না থাকলেও সাধারণ মানুষ যে নিউক্লিয়ার প্রকল্পের বিপজ্জনক দিকগুলো সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন, তা নয়। কিন্তু আমাদের মতো গরীব দেশে এসব ঝুঁকি সত্ত্বেও কাজের মানুষের অভাব হয় না। সামান্যতম নিরাপত্তা ছাড়াই তাঁরা দিনের পর দিন কাজ চালিয়ে যান। আমেরিকার জনসংযোগ কেন্দ্রের প্রধান ক্লিফোর্ড বেক্, '72 সালে তারাপুর পরিদর্শনে এসে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এখানে শ্রমিকেরা লম্বা বাঁশের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল ঘাঁটেন। অবশ্য এ দৃশ্য আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক। সে জন্যই তারাপুরে যদিও 250 জন শ্রমিকের দরকার কিন্তু বছরে প্রায় 1300 শ্রমিক পাল্টান হয়, যাদের প্রত্যেকেই ভীষণ বেশী মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ভাড়া করে আনা শ্রমিকদের তো দূরস্থান, প্ল্যান্টের স্থায়ী কর্মীদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। অথচ আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়ারও রীতি নেই। হয়ত এই সমস্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতেই কর্তারা সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণ করে বসে আছেন সিদ্ধিদাতা গণেশের হাতে। তারাপুরের চীফ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর ঘরের মাথায় বসানো আছে এক গণেশ মূর্ত্তি। যে কেউ গেলেই দেখতে পাবেন।

তিল থেকে তাল

DAE-র মতে এ জাতীয় কেন্দ্রের মধ্যে তারাপুর এশিয়ায় বৃহত্তম। দুটো বয়েলিং ওয়াটার-টাইপ রিঅ্যাক্টর নিয়ে তৈরী এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 400 মেগাওয়াট। '77 সাল থেকে আবার কোন অজ্ঞাত কারণে এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 410 মেগাওয়াট। সত্যি মিথ্যে যাচাই করার কোন সুযোগ নেই। তবু যতটুকু জানা যায়—দুটো রিঅ্যাক্টর প্রায় কখনোই একসঙ্গে কাজ করে না, আর এক-একটার ক্ষমতা 190 মেগাওয়াটের বেশী কখনোই নয়।

খরচের কথাটা একবার ভাবা যাক। '64 সালের হিসেব অনুযায়ী নির্ধারিত খরচ ছিল প্রায় 49 কোটি টাকা, অবশ্য জ্বালানী খরচ বাদ দিয়ে। অথচ সরকারী হিসেবমতে জ্বালানী, পরিবহণ আর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য

জমা রাখার খরচ বাদ দিয়েই এ পর্যন্ত 97·12 কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই প্ল্যান্টের পিছনে! তাছাড়া প্ল্যান্ট চালু রাখার জন্য প্রতি বছরই তো কিছু খরচ আছে। বিস্তারিত কোন হিসাবপত্র না দেখিয়েই তারাপুর থেকে উৎপন্ন প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের খরচ ধরা হয়েছিল 5 পয়সা। ঐ অঞ্চলে তাপবিদ্যুতের খরচ তখন ইউনিট প্রতি 5·5 পয়সারও বেশী ছিল। এ ধরনের অসম তুলনা থেকেই বোধহয় তারাপুর কেন্দ্র এত সহজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনই নয়, এর আরো একটা উপযোগিতা দাবী করা হত।—বলা হত এর সাহায্যে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে জল আর বিদ্যুতের সমস্যা মিটিয়ে অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে দেওয়া সম্ভব হবে। এ তো গেল সরকারী মত। এদিকে বেসরকারী মতে পারমাণবিক বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় 20 পয়সার কম হতেই পারে না।

কানা কন্যের নানা রোগ

TAPS-এর দুই ইঞ্জিনীয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অসংখ্য ত্রুটির অন্যতম ক'টি

1. প্রেসার রেগুলেটার কোনটাই যথাযথ কাজ না করায় মাঝে মধ্যেই প্ল্যান্ট আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায় (বিশেষ করে 1নং ইউনিট)।

2. কণ্ট্রোল ভালভে অনিয়ন্ত্রিত কম্পনের ফলে এর সঙ্গে লাগান পাইপগুলোতে ফাটল ধরে যাচ্ছে।

3. তেলের লাইনের ভালভগুলো প্রায় প্রতি 15 দিন অন্তর সারানোর দরকার হয়।

4. জলীয় বাষ্প বার হওয়ার পথ না থাকায় যন্ত্রাংশ চটপট ক্ষয়ে যায়।

5. সবচেয়ে অসুবিধা হয় কোন যন্ত্রাংশ পাল্টাতে হলে। আমাদের দেশে তো বটেই, বিদেশের বাজারেও এগুলো মেলা কঠিন। কারণ, সেগুলো ব্যাকডেটেড।

এতসব অসুবিধা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের মনের জোরেই তারাপুর আজও টিঁকে আছে।

সর্পতে রজ্জুভ্রম

তারাপুর কেন্দ্রের সঙ্গে আমেরিকার নিজেদের স্বার্থও জড়িয়ে রয়েছে। কারণ এখান থেকে পাওয়া প্লুটোনিয়ামের বেশীর ভাগ অংশই আমেরিকাতে পাঠানোর কথা—তাদের "শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে" ব্যবহারের জন্য। তাই তাদেরই সহায়তায় তারাপুরের কাছে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশণ কেন্দ্রের কাজ ভালই এগোচ্ছিল। কিন্তু '74 সালের পোখরান বিস্ফোরণের পর থেকে গোটা পরিস্থিতিটাই বদলে যায়। বলা হয়, ভারত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অবশ্য ভারত-আমেরিকার চুক্তির কে কতটা অবমাননা করেছে সে তথ্য মেলা ভার। তবে এই ঘটনা অনেককে সতর্ক বা সজাগ করেছে। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য থেকে যাতে প্লুটোনিয়াম না বার করে নেওয়া যায় সেজন্য ভারতকে IAEA (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জী এজেন্সী)-এর নজরদারী ক্যামেরা বসানোর দাবী মেনে নিতে হয়েছে। তারাপুরের সেই নিষ্কাশণ কেন্দ্রের অবস্থাও খুব ভালো নয়। এদিকে সংরক্ষণ ক্ষমতার দ্বিগুণ পরিমাণ বর্জ্য জমা রাখার জন্য তেজস্ক্রিয় দূষণের মাত্রা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। আপতত এই কেন্দ্রের কাজ বন্ধ। অবস্থার উন্নতি ঘটাতে বিদেশী প্রযুক্তির দরকার। কিন্তু এখন তা পাওয়াও অসম্ভব। কাজেই TAPS-এর ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শান্তির জন্যেই কি পরমাণু?

তারাপুর যদি তার নির্ধারিত মাত্রায় কাজ করে তবে সেখান থেকে বছরে প্রায় 130 কিলো প্লুটোনিয়াম পাওয়ার কথা। যা দিয়ে ইচ্ছে করলে হিরোসিমা নাগাসাকির 12 গুণ জোরাল বোমা বানান সম্ভব। এটা অবশ্য নিতান্তই "যদি" আর "তবে"-র প্রশ্ন। তবে আমাদের দেশে যেমন "শান্তির পরমাণু" আর "যুদ্ধের পরমাণুর" মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য পাঁচিল কল্পনা করা হয়, বাস্তবে তার অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব।

'78 সাল থেকে চালু হওয়া "নন-প্রলিফারেশন অ্যাক্ট"-এর সাহায্য নিয়ে আমেরিকা এখন তারাপুর চুক্তি অগ্রাহ্য করছে। এই আইন অনুযায়ী একটা দেশ শুধুমাত্র একটা যুদ্ধবিরোধী দেশকেই সাহায্য করতে পারে (অবশ্য নিজেদের অস্ত্র তৈরীতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই)। পরমুখাপেক্ষী তারাপুরকে তাই জ্বালানীর সমস্যা মেটাতে এবারে ফ্রান্সের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অবশ্য সেটাও কতটা আশার কথা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ এর আগেও ফ্রান্স একবার "ব্রীডার রিঅ্যাক্টর" তৈরীর ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে তা ফিরিয়ে নিয়েছিল। কাজেই আমেরিকার সাহায্য বন্ধ হওয়ার দরুন তারাপুরের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। আর এ সমস্ত ঘটনা শুধু তারাপুর নয়, গোটা নিউক্লীয় প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই প্রশ্ন জাগায়।

ভাবানুবাদ ☐ **অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়**

সংবাদে বিভ্রান্তি

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে, নয় বছরের এক বালক যে কোনো কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করার গানিতিক সমস্যাটির সমাধান করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। ঐ বালকের সম্ভাব্য গানিতিক প্রতিভার কথা অস্বীকার না করেও বলা যায়, সংবাদটি বিভ্রান্তিকর। কারণ, বহুদিন আগেই এটা গানিতিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, শুধুমাত্র রুলার ও কম্পাসের সাহায্যে যে কোনো কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করার কোনো সাধারণ পদ্ধতি থাকতে পারে না। ☐ **সন্ধানী**

॥ না, পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু চুল্লী চাই না ॥

হ্যাঁ, এ রাজ্যে পরমাণু চুল্লী বসানোর পরিকল্পনা চলছে। পরিকল্পনা চলছে, যখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষ পরমাণু কার্যক্রমের বিরোধিতায় উত্তাল। গত তেরই মার্চ কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবারে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠনের এক সভায় এ বিষয়ে এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা নিচের চিঠিটি পাঠাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। বি-ও-বি'র পাঠকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব ব্যক্তি ও সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করুন অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে—প্রয়োজনে বৃহত্তর প্রচার অভিযান গড়ে তোলায়। আপনাদের গৃহীত কার্যক্রমের সংবাদ পাঠান এই ঠিকানায়: আহ্বায়ক, পিপলস সায়েন্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি, প্রদীপ দত্ত, পূর্ব নারায়ণতলা, নজরুল পার্ক, পোঃ অশ্বিনী নগর, কলিকাতা 700 059 □

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু,
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা 1

মহাশয়,

আমরা অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের সাথে বিভিন্ন সংবাদসূত্রে খবর পাচ্ছি, গত কয়েক বছর ধরে ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক চুল্লি বসাবার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সংবাদসূত্রের খবরে ধারণা হয়েছে, রাজ্য সরকারেরও এ ব্যাপারে কোনও বিরোধিতা নেই। এতে আমরা শঙ্কিত বোধ করছি।

আপনি নিশ্চই অবগত আছেন, গত প্রায় দুই দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের কাজে ভাঁটা পড়েছে। ডেনমার্ক, সুইডেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর পারমাণবিক শক্তির পথ নয়। বিশ্বব্যাপী নানান গবেষণা, সমীক্ষা ও গণ-আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে—

(1) সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিলের মত মারাত্মক দুর্ঘটনার কথা বাদ দিলেও, যে কোন 'নিরাপদ' পারমাণবিক চুল্লিই কার্যত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের পক্ষে ভয়াবহ।

(2) পারমাণবিক বিদ্যুৎ মোটেও সস্তা নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এমনকি তাপবিদ্যুতের তুলনায়ও তার ব্যয় হবে অনেক বেশী।

(3) পারমাণবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনার ভয়াবহ ফলশ্রুতি ক্রমশ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তা সঞ্চারিত হয়।

(4) পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ সংরক্ষণ পৃথিবীর কোনও দেশে আজ অবধি সম্ভব হয়নি।

(5) পারমাণবিক প্রকল্পগুলি শেষ বিচারে সামরিকীকরণের সহায়ক উপাদান হিসাবে কাজ করে এবং 'মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'-এর শক্তি বৃদ্ধি করে।

পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক চুল্লী বসালে সামগ্রিক বিচারে এ রাজ্যের ক্ষতি হবে। বিশেষত এ রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব এত বেশী যে পারমাণবিক চুল্লী সরাসরি এ রাজ্যের জনস্বাস্থ্যের উপর আঘাত হিসেবেই আবির্ভূত হবে। স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার।

"পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক চুল্লী বসালে সামগ্রিক বিচারে এ রাজ্যের ক্ষতি হবে। বিশেষত এ রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব এত বেশী যে পারমাণবিক চুল্লী সরাসরি এ রাজ্যের জনস্বাস্থ্যের উপর আঘাত হিসেবেই আবির্ভূত হবে। স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার।"

এ রাজ্যের মানুষের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে আপনার কাছে আমাদের জরুরী আবেদন—

পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক চুল্লী বসানোর কোনো প্রস্তাবে অনুমোদন দেবেন না।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ—

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্যবৃন্দ ॥

অ্যামনিওসেন্টেসিস
একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

দীপক

অ্যামনিওসেন্টেসিস—কেন

1979-80 থেকেই দিল্লী, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, কলিকাতা এবং বিশেষত বোম্বেতে অ্যামনিওসেন্টেসিস নামক পরীক্ষাটির ক্লিনিক বাড়তে থাকে।[1] তারও আগে থেকে অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব মেডিকাল সার্ভিসেস (AIIMS, দিল্লী), ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন রিপ্রোডাকশন (IRR, বোম্বে) এবং হরকিষেণ দাস হাসপাতালে (বোম্বে) অ্যামনিওসেন্টেসিস করানো হচ্ছিল, শুধুমাত্র ভ্রূণের কিছু জেনেটিক ত্রুটি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে। 1970-এ প্রথম Amniocentesis শুরু হয় এদেশে।[1,2] তখন গভীরতর প্রজনন-বিজ্ঞান ও ধাত্রীবিদ্যার গবেষণার স্বার্থেই ঐ পরীক্ষার ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু 1978 থেকেই AIIMS এবং হরকিষেণ দাস হাসপাতালের কাছে বহু ব্যক্তি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করানোর আবেদন করতে থাকেন। তখন বাধ্য হয়ে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকাল রিসার্চ (ICMR)-এর নির্দেশে AIIMS লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা নিষিদ্ধ করেন। বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা প্রথমে একে শুধু 'প্রজনন-বিপ্লবের হাতিয়ার' ঘোষণা করলেও, অচিরেই ডাক্তাররা, গর্ভপাত-ক্লিনিকের মালিকরা এবং উচ্চবিত্ত পরিবারগুলি একে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করলেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থেকে শুরু করে ক্রমে প্রায় সব ধাত্রীবিদ্‌ই পরীক্ষা করতে লাগলেন, মোটা ফি পেতে লাগলেন। অপর পক্ষে, উচ্চবিত্ত বাবা-মা'রাই প্রথমে পরীক্ষা করাতেন, কিন্তু ক্রমে মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত বস্তিবাসী শ্রমিক বাবা-মা'ও কয়েকশো টাকা দিয়ে পরীক্ষা করে জানতে থাকলেন, ছেলে না মেয়ে।[1,3] বহু বাবা-মা-ই, জানেন না ভালো করে যে, অ্যামনিওসেন্টেসিসের মাধ্যমে ভ্রূণের বংশগত, ত্রুটি নির্ণয়ই এর মূল কার্যকারিতা![4]

হিমোফিলিয়া নামক বংশগত রোগটিকেও অ্যামনিওসেন্টেসিসে নির্ণয় করা যায়। এই রোগে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এ রোগটি শুধুমাত্র পুরুষেরই হয়। প্রথমত, অধিকাংশ ডাক্তার হিমোফিলিয়া নির্ণয়ের কথা রোগীকে জানান না, অন্তত এর জন্যে পরীক্ষা করাতে বলেন না। দ্বিতীয়ত, হিমোফিলিয়া যদি নির্ণীত হয়ও কোন ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ডাক্তার কি ঐ ত্রুটিযুক্ত পুং-ভ্রূণটিকে গর্ভপাত করাতে পরামর্শ দেন? পরামর্শ দিলেও, বাবা-মা ছেলে সন্তানকে হত্যা করবেন? কখনও নয়। কিন্তু, কোন জেনেটিক ত্রুটি নির্ণীত না হওয়া সত্ত্বেও, শুধুমাত্র ভ্রূণের স্ত্রী-লিঙ্গ নির্ণীত হওয়ার কারণেই, ডাক্তারও পরামর্শ দেন গর্ভপাত করাতে এবং বাবা সহ পরিবারও তো তাই করার জন্যে মুখিয়ে থাকেন। Women's Centre-কৃত বোম্বের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শহর বোম্বেতে লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষার পর যে আট হাজারটি গর্ভপাত হয়েছে, তার মধ্যে 7999টিই স্ত্রী-ভ্রূণ![5] বোম্বের হরকিষেণ দাস নামক হাসপাতালে 1980 থেকে '85-র মধ্যে 7800টি পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে মাত্র 5% দম্পতি এসেছিল জেনেটিক ত্রুটি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, 1% পুং-ভ্রূণ গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে এবং 94% এসেছিল স্ত্রী-ভ্রূণ গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে। পরীক্ষার পর 50% স্ত্রী-ভ্রূণ বলে নির্ণীত হয় এবং গর্ভপাত হয়। এবং বাকি 50% পুং-ভ্রূণ বলে নির্ণীত হলেও, একটি গর্ভপাতও হয়নি।[3]

অ্যামনিওসেন্টেসিস কী

Amniocentesis — Amnion (membrane) + Kentesis (pricking) অর্থাৎ ভ্রূণের বহির্ঝিল্লী বা পর্দার আবরণ ছেদ করে ছুঁচলো কোন বিশেষ ধরনের needle-এর সাহায্যে জরায়ু থেকে 15-20 মিলি-লিটার অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বার করে আনা হয় এই টেকনিক্যাল প্রক্রিয়ায়। তারপর অ্যামনিওটিক ফ্লুইড থেকে ভ্রূণ কোষকে আলাদা করে নিয়ে ভ্রূণকোষের ক্রোমোজমের বিশ্লেষণ করা হয় পরীক্ষাগারে। এটা সাধারণত গর্ভধারণের 14-18 সপ্তাহে করা হয়, কারণ, ঐ সময়েই গর্ভফুলকে (placenta) ক্ষতি না করে গর্ভ থেকে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বার করা আপেক্ষিকভাবে সহজ, যে ফ্লুইডের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভ্রূণ কোষ থাকে। পরবর্তী ক্রোমোজম বিশ্লেষণ করে "mongolism, defects of neural tube in foetus, retarded muscular growth, 'Rh'-incompatibility, haemophilia and other types of abnormal babies" ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।[4,6] কিন্তু, অ্যামনিও-সেন্টেসিস পরীক্ষার সাহায্যে প্রায় সর্বত্রই জেনেটিক ত্রুটি নির্ণয়ের চেয়ে, অনেক বেশি পরিমাণে লিঙ্গ নির্ণয় করা হচ্ছে।

কী কী সম্ভাব্য ক্ষতি ও সীমাবদ্ধতা

পরীক্ষায় নির্ণীত ভ্রূণটি স্ত্রী বলে গর্ভপাত করার পর দেখা গেছে ভ্রূণটি পুরুষ, এরকম ঘটনাও কিছু ঘটেছে। আসলে, এ পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিখুঁত ফলাফলের সম্ভাবনা 95% প্রায়। অর্থাৎ প্রায় 5% নির্ণয়ের ফলাফলই ভুল হতে পারে। যাই হোক, এই ভুলের জন্য অবশ্য ভ্রূণের বা গর্ভবতী নারীর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু, অন্যান্য কারণে, অ্যামনিও-সেন্টেসিসের ফলে ভ্রূণের বা মা'র শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। যথা—

(1) এ পরীক্ষার ফলে ভ্রূণ ও গর্ভফুলের ক্ষতি হতে পারে, যার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) গর্ভপাত এবং অপরিণত (premature) প্রসব হতে পারে।

(2) Hip dislocation (কোমরের নিম্নাঙ্গের স্থান-চ্যুতি।

(3) শ্বাস ঘটিত (respiratory) জটিলতা।

(4) Reproductive tract (জননাঙ্গ)-এ সংক্রমণ ঘটতে পারে, যদি incision (ছেদন) ও piercing of amniotic sac (অ্যামনিওটিক থলের বিদারণ) করার সময় কঠোরভাবে নিরাপদ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানা না হয়। এক্ষেত্রে না মানার সম্ভাবনা শহরতলীর ছোট ছোট ক্লিনিকে যথেষ্ট বেশি। কারণ, যেনতেন ভাবে অর্থ উপার্জন করাটাই এদের পেশা।[7,8]

(5) Voluntary Health Association of India (VHAI) বোম্বেতে 242টি কেস সমীক্ষা করে জানিয়েছে, অপরিণত গর্ভাবস্থায়ই প্রসবের ঘটনা 4% প্রায়।[7] "Ante-natal Sex Determination and Fertility Clinic" নামক প্যামফ্লেটে ডাক্তার এস. ভাণ্ডারী যখন বলছেন, ঐ পরীক্ষা করাতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাতের সম্ভাবনা 0·1% তখন VHAI দীর্ঘদিন সমীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছে যে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাতের সম্ভাবনা 1·5%।[2] বোম্বের হরকিষেণ দাস ও পার্ল সেন্টারে অ্যামনিওসেন্টেসিস করানোর সময় ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।[6]

যেহেতু 16 সপ্তাহর আগে এই পরীক্ষা করা যায় না এবং পরীক্ষা করতে আরো এক সপ্তাহ, দূরবর্তী মা-বাবার পরীক্ষার রিপোর্ট জানতে জানতে আরো এক সপ্তাহ লাগে, সেহেতু যখন গর্ভপাত করানো হয়, তখন ভ্রূণের ন্যূনতম বয়স 18 সপ্তাহ হয়। এরকম অবস্থায় গর্ভপাত মা'র স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।[2,6]

ভারতের প্রায় সব বড় শহরেই অ্যামনিওসেন্টেসিসের ক্লিনিক রয়েছে। কিন্তু, গ্রামে, মফঃস্বল টাউনে বা জেলা শহরগুলোয় সাধারণত এরকম ক্লিনিক এখনও নেই। অথচ মহানগরীতে শ'খানেক টাকায় পেটের বাচ্চা ছেলে না মেয়ে, তা জানার ব্যবস্থা আছে—একথা পোস্টার, প্যামফ্লেট, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রামেও পৌঁছে গেছে। ফলে, দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ আসছে পরীক্ষা করাতে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ নামকে ওয়াস্তে। কার্যত মগের মুলুক। হাতুড়ে ডাক্তার, ক্ষতিকর ওষুধ ও পদ্ধতিতে দেশের কোটি কোটি মানুষ অন্য সব ক্ষেত্রে যেভাবে ভোগে, এক্ষেত্রেও একই দৃশ্য।

বায়োটেকনোলজি দিয়ে সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা?

অ্যামনিওসেন্টেসিসের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, ভ্রূণের জেনেটিক ত্রুটি নির্ণয়। পরবর্তীকালে, এ ধরনের জেনেটিক ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়টাও জরুরী হয়ে দাঁড়াল। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-ভ্রূণ এ ধরনের ক্রোমোজমীয় ত্রুটি নিছক বহন করে কিন্তু পরবর্তী জীবনে প্রকাশ করে না। অথচ, পুং-ভ্রূণের ক্রোমোজমীয় ত্রুটি বহনের ও প্রকাশের সম্ভাবনা বেশী।[4] সে কারণে, প্রথম দিকে বিশেষজ্ঞরা ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণের অধিকারী বাবা-মাকে ঐ পুং-ভ্রূণটি গর্ভপাত করাতে পরামর্শও দিতেন। যদিও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাবা-মা তা করতেন না। বাবা-মাকে আরো স্বচ্ছন্দ, 'আকাঙ্ক্ষিত', 'সুবিধাজনক' গর্ভধারণ, প্রসব ও শিশুপালনের সুযোগ দেবার কথা ঘোষণা করে, ডাক্তার-বিজ্ঞানীরা এরপর থেকে জানাতে শুরু করেন,—অ্যামনিও-সেন্টেসিসের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে পরিবার মুক্ত হতে পারেন। কী ভাবে? 'ব্যালান্সড্ ফ্যামিলি' অর্থাৎ একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সংসার কিংবা একটিই ছেলের সংসার হলে, পরিবারও 'সুখী পরিবার' হয় এবং "জাতির বর্তমান সংকটের মূল কারণ যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি", তার ঊর্ধ্বগতি কমে। সত্যি বলতে কি, আমলা, বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তার এবং শাসকগোষ্ঠীর একাংশ দশ বছর ধরে সব জেনেও যে চুপ করে বসে আছেন, তার একটা মূল কারণ, লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা ও তদ্‌পরবর্তী গর্ভপাতকে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে দেখছিলেন এঁরা।

আসলে যে দুটো সমস্যার সমাধানের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে অ্যামনিও-সেন্টেসিসের প্রয়োগে সেই দুটো সমস্যা দুরকম। একটা সমস্যা হল, একটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কমিয়ে দিয়ে দেশ শাসনের সুবিধে হওয়া। কিন্তু, সব শ্রেণীর, সব গোষ্ঠীর, সব জাতির জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে একটা পরিকল্পিত হিসেবে কোন কোন 'অবাঞ্ছিত', 'অক্ষম', 'অযোগ্য' গোষ্ঠী বা জাতিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য করে নিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে রোধ করতেই রাষ্ট্র, শাসকশ্রেণীর বেশি উৎসাহ। আধুনিক শাসকগোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় আরো বেশি করে বুঝছেন, সমাজের যেসব ক্ষেত্রের সমস্যা মানুষের নিজস্ব ইচ্ছে, রুচি, পছন্দের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত, যেমন, বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রথা, বিবাহবিচ্ছেদ, ধর্মাচরণ, গর্ভধারণ, জন্মদান ইত্যাদি, সে সব সমস্যার মোকাবিলায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ আর অত স্থূলভাবে, প্রকাশ্য জবরদস্তিভাবে কায়েম করা যাবে না। লক্ষ্যণীয়, সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্র জনগণের ইচ্ছে ও আচরণের ওপর সুনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছেন সূক্ষ্মভাবে, বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-ধর্মগুরুদের সক্রিয় সাহায্য নিয়ে। আরো বেশি বেশি করে, বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরণে সংযুক্ত করা হচ্ছে। এটা অবশ্য সারা বিশ্ব জুড়েই আধুনিক শাসক-স্ট্র্যাটেজি।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হল, সমাজে ও পরিবারে কন্যার আর্থ-সামাজিক মর্যাদা, অবস্থান ও ভূমিকা ক্রমশ নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। তাই পরিবার কন্যার চেয়ে পুত্রই চায় বেশি। কঠোরভাবে পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজ। হাজার হাজার বছর ধরেই, বৈদিক আমল থেকেই ভারতীয় পরিবারে কন্যা বা স্ত্রীর মর্যাদা অত্যন্ত হীন। বর্তমানে, পণপ্রথা, যৌতুক, বধূহত্যা এবং ধর্ষণ ইত্যাদির এক সামাজিক মহামারী দেখা দিয়েছে। একটি কন্যাকে জন্ম দিয়ে, কষ্ট করে মানুষ করা এবং পরে আরো কষ্ট করে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে পরিবার একটি 'সামাজিক নির্বাচন' করে যে, জন্মের আগেই কন্যা ভ্রূণটি মেরে ফেলা হোক। আসলে, পরিবার দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অনিরাপত্তার শিকার হচ্ছেই। 'সংসার বাড়ুক সুখে, সংখ্যায় নয়'। তাই, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ দারিদ্র্য, সামাজিক মূল্যবোধ, কন্যাবিদ্বেষী মনোভাবের চাপে পড়ে ডাক্তার ও ক্লিনিকের প্রলোভনে ধরা পড়ে। কিন্তু,

এই ব্যাপক অ্যামনিওসেন্টেসিস ও নির্ণীত স্ত্রী-ভ্রূণের গর্ভপাত কি পরিবারের অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান করে? পরিবারে ও সমাজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থানের এতটুকুও উন্নতিসাধন করে?

অ্যামনিওসেন্টেসিসের পক্ষে প্রথম যুক্তিটি টেকনোলজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আগত। টেকনোলজি দিয়েই সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে, এরকম সরলীকৃত পদ্ধতিতে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চান এঁরা। কিন্তু বস্তুত তা ঘটে না। প্রথমত, জেনেটিক ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণর গর্ভপাত করে সেই ভাবী শিশুটিকে না হয় 'বাঁচানো' হল ভাবী অনিবার্য বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে। কিন্তু, যেসব লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্ম হচ্ছেই অ্যামনিওসেন্টেসিস পরীক্ষাকে এড়িয়ে গিয়ে, অত্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই, সেসব শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং ভাবী শিশুদের জেনেটিক ত্রুটির জন্য তারা তো তাহলে সমাজে ও পরিবারে নির্যাতিত হবেনই?! খুবই গভীরতর মানবিক সংকটের প্রশ্ন এটি। জন্মগতভাবে 'ত্রুটিপূর্ণ' শিশু / মানুষকে কোন মানুষই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু, বায়োটেকনোলজি এখনও এমন উন্নত স্তরে পৌঁছেছে কি, যার ফলে, গ্যারান্টি দিতে পারে 'ত্রুটিমুক্ত' শিশুর জন্মের? দ্বিতীয়ত, জেনেটিক পরীক্ষার সময় ভ্রূণ ও প্রসূতি নারীর স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্ভাবনার প্রশ্নটিও এড়িয়ে গেলে চলবে না। তৃতীয়ত, শুধু জেনেটিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই অ্যামনিওসেন্টেসিস করা হবে বলে ঘোষণা করলেও, আজ দেশ জুড়ে বড় বড় শহরে লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষার জন্যই এটি করা হচ্ছে। প্রযুক্তির এই অপব্যবহার কোন দুর্ঘটনা নয়। যে সমাজে যে ব্যবস্থায় কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, সেই সমাজের রীতিনীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং পার্থিব স্বার্থের প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে প্রযুক্তি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অ্যামনিওসেন্টেসিসও নিরপেক্ষ থাকেনি।

দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রকাশ্যে খুব বেশি উচ্চারিত হয়নি, অন্তত সরকারী আমলা, বিশেষজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। যুক্তিটি হল—সরবরাহ কমানো হলে, সেই বস্তু বা প্রাণীর চাহিদা তথা মূল্য বাড়বে। এটা সার্বিক সত্য নয়। সমাজ এত সরল প্রক্রিয়ায় চলে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই চাহিদা বৃদ্ধির যুক্তিটির অসারতা বোঝা যাবে।[9]

সারা ভারতে যখন ক্রমাগত **sex ratio** (পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে নারীর সংখ্যা) কমছেই, তখন কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে **sex ratio** কখনো বাড়ছে, কখনো সমান-প্রায় থাকছে। অথচ, বিভিন্ন সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ঐ তিনটি রাজ্যে নারীরা সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি হারে সক্রিয় অংশ নেন এবং নারীদের শিক্ষার হারও বেশি। অন্যত্র কন্যা নির্যাতনের ব্যাপকতা যত ভয়াবহ, সে তুলনায় কেরল, তামিলনাড়ুতে নির্যাতনের ভয়াবহতা কিছুটা কম।[10] 1961-র আগেও, দু বছর বয়স অব্দি শিশুর মধ্যে কন্যা মৃত্যুর হার পুত্র মৃত্যুর হারের চেয়ে 60%বেশি ছিল। অথচ 1981-এর পরও আজ, 8-9 বছর বয়স অব্দি শিশুর মধ্যে কন্যা মৃত্যুর হার 60% বেশি। বিভিন্ন স্বাস্থ্য, মেডিকাল ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষায় এ কথা আজ প্রমাণিত, শিশু মৃত্যুর হার তথা কন্যা মৃত্যুর হারের মধ্যে দিয়ে সমাজের কতগুলো সামাজিক বৈষম্য প্রকাশিত হয়। যে সমাজে নারীর মর্যাদা যত কম, সে আর্থসমাজে পরিবারে কন্যার প্রতি তত বৈষম্য ঘটানো হয়। ফলে, কন্যা মৃত্যুর হারও বেশি হয়। 1961-র পর থেকে এ দেশে নারীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। তবুও নারীর মর্যাদা বাড়ল না কেন?[10] এমনিতেই এ দেশে, প্রতি 100 কন্যা জন্মের অনুপাতে 104 থেকে 107টি পুত্র জন্মের হার বর্তমান। এমনিতেই তো পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। অথচ গত কয়েক শতকেও কখনোই কি নারীর সামাজিক মর্যাদা তার কারণে বেড়েছে?[11]

উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাবে কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে ভয়াবহ কম। সেখানে, এক পরিবারের একগুচ্ছ ভাই কিংবা জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাইদের মধ্যে একজন স্ত্রী বহু-ভোগ্যা হন। এতে, ঐ স্ত্রীর মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ে না। কারণ, সে উপার্জনহীন এবং সম্পত্তির মালিক নয়। সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে, স্বামীরাই সম্পত্তির মালিক।[12] ইউরোপের দেশসমূহে **sex ratio** বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশের তুলনায় অধিকাশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় দেশসমূহের **sex ratio** বেশি।[13] তো, ইউরোপীয় দেশে নারীর সংখ্যা বেশি বলে সেখানে নারীর মর্যাদা কম এবং ভারতে নারীর সংখ্যা কম বলে, এখানে নারীর মর্যাদা বেশি? এমন অবাস্তব কথা কেউ বলবেন না নিশ্চয়ই। এদেশে এখনও, কন্যা সন্তানকে জন্মের পরই রাস্তায় ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে, মা'র স্তন-বোঁটায় আফিম মাখিয়ে রেখে শিশু কন্যাকে হত্যার চেষ্টা হয়,[14] 7-8 বছর বয়স থেকেই কন্যাকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে গৃহকর্ম করতে বাধ্য করা হয়, তারপর তো পণপ্রথা, বৌ-পেটানো, বধূহত্যা ইত্যাকার জনপ্রিয় ঘটনা আছেই। কোন জাতি বা সম্প্রদায় বা শ্রেণীর ওপর নিপীড়ন কমানোর জন্য সেই জাতি বা শ্রেণীর সংখ্যা কমানো এবং নিপীড়ন সম্পূর্ণ লোপের জন্য সেই জাতি বা শ্রেণীর সম্পূর্ণ লোপ করার দর্শনটি তাহলে মেনে নিতে হয়!

আরেকটি যুক্তি দেওয়া হয়, 'ব্যালান্সড্ ফ্যামিলি' অর্থাৎ পরিবারে পুত্র-কন্যার সংখ্যার ভারসাম্য অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের 'সুখী পরিবারে'র মত একটি ছেলে-একটি মেয়ের জন্মের স্বার্থেই অ্যামনিওসেন্টেসিস নাকি করানো দরকার। যে মায়ের একটি বা দুটি কন্যা আছেই, তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানটি যাতে ছেলেই হয়, সেজন্যে ঐ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা করে জানা উচিত, ওটি ছেলে না মেয়ে। মেয়ে হলে গর্ভপাতই করা উচিত। কিন্তু, এই একচক্ষু-বিশেষজ্ঞরা কি জানেন না, ভারতীয় সাম্যের দেশে ('ভারতবর্ষ সাম্যের এক নাম'!) পুত্র সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে এবং কন্যা সংখ্যা একে বা শূন্যে নামানোর জন্য পরিবার তাবিচকবচ, ডাক্তার বদ্যি, গর্ভপাত সবই করায়! কোন এক বা দুই পুত্রের জনক জননী কি কখনো (তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানটি যাতে কন্যাই হয়) 'ব্যালান্সড্ ফ্যামিলি'র স্বার্থে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভ্রূণটি পুং-ভ্রূণ জেনে গর্ভপাত করাবেন?

অ্যামনিওসেন্টেসিস কি গ্যারান্টি দিতে পারে, পুত্রই জন্মাবে? কিংবা

পরবর্তী ভ্রূণটি স্ত্রী-ভ্রূণ হবে না? গ্যারান্টি দিতে পারে না। তাহলে, ঐ কন্যা না জন্ম দিয়ে শুধু পুত্রই জন্ম দিতে হলে, অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় আক্রান্ত মাকে কতবার ঐ পরীক্ষা ও গর্ভপাত (18 সপ্তাহের গর্ভধারণে) করাতে হবে? খাদ্যের অভাবে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে, নিরাপদ চিকিৎসার অভাবে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কারণে, ভারতীয় নারীকে একটি পুত্র সন্তান বাঁচিয়ে রাখতে হলে, গড়ে অন্তত 6টি সন্তানের জন্ম দিতে হবে। অর্থাৎ 4-5টি সন্তান মারা যাবে।[15] দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যাও কয়েক কোটি। তো, আর্থ-সামাজিক কারণেই, পরিবার পুত্রজন্মই বার বার চাইবে। এ হেন পরিস্থিতিতে, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সব শ্রেণীর মধ্যেই অ্যামনিওসেন্টেসিস জনপ্রিয় হচ্ছেই।

লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা জনপ্রিয় হচ্ছে—

"The Scarcer Half"-এর লেখক বোম্বে এবং ধূলে (উত্তর মহারাষ্ট্রের এক জেলা শহর) নামক স্থানে এক বিস্তৃত সমীক্ষা করে দেখেছেন —1983 থেকেই প্রচুর ক্লিনিক গড়ে উঠেছে, এই পরীক্ষা করানোর জন্য। বোম্বের শহরতলী ভাণ্ডাপ-এ এক কি. মি. অঞ্চলেই তিনটি ক্লিনিক আছে। বোম্বে এবং অধিকাংশ শহরের অধিকাংশ ক্লিনিকে অন্তঃসত্ত্বা নারীর গর্ভ থেকে শুধু amniotic fluid বার করে আনার কাজটি হয়। তারপর ঐ fluid পাঠানো হয় নিকটবর্তী বড় হাসপাতালে বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেন্টারে পরীক্ষা করাতে। বোম্বেতে 1983-র প্রথমার্ধ অব্দিও তিনটে ক্লিনিক ছিল। 1985-র শেষে অন্তত 20টি ক্লিনিক হয়েছিল। 1987-র শেষে এ সংখ্যা অন্তত তিরিশটি হবে। বড় ক্লিনিকগুলো বছরে গড়ে অন্তত দেড় হাজারটি লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা করে। যে ধূলের আড়াই লাখ লোক 1983-তেও এ ধরনের ক্লিনিক দেখেননি, সে ধূলেতেই 1985-তে পাঁচটি ক্লিনিক হয়েছে। জলগাঁও, অমরাবতীর মত দূরবর্তী মহারাষ্ট্রীয় ছোট শহরেও এ ধরনের ক্লিনিক বাড়ছেই।[2]

বোম্বের প্রতিটি লোকাল ট্রেনের কামরায় এ ধরনের ক্লিনিকের বিজ্ঞাপন চোখে পড়বেই।[2] স্থানীয় পত্রিকার গসিপ-কলমে হেমা মালিনী, রাজকন্যা ডায়ানার ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা হয়েছে বলে মুখরোচক খবর বেরোচ্ছে।[16] হয়তো এ খবর পড়তে পড়তেই নিম্নবিত্ত বাবা টাকা ধার করতে ছুটছেন, ঐ টাকায় স্ত্রীর পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে তা পরীক্ষা করবেন। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, দিল্লী, গুজরাট, পাঞ্জাব, কোলকাতা সর্বত্রই ঐ পরীক্ষা প্রথমে উচ্চবিত্ত 'শিক্ষিত' শহুরে 'সুখী পরিবাররা'ই করাচ্ছিল। কিন্তু, আলাদা আলাদা দশ বারোটি সমীক্ষাতেই প্রকাশ যে, বর্তমানে এই পরীক্ষা এক দেড়শো টাকায় মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নবিত্ত বস্তিবাসী ও মফঃস্বলবাসী 'অশিক্ষিত' পরিবারও করাচ্ছে।

টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় (22/10/84) মালিনী কার্কণ্ড নামে খ্যাতনামা জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট করেছেন যে, মায়েরা প্রথম/দ্বিতীয় গর্ভধারণের সময়ই ভ্রূণের wrong sex (কন্যা ভ্রূণ) জেনে নিয়েই গর্ভপাত করাচ্ছেন। Women's Centre বোম্বেতে এক সমীক্ষা (1984) করে জানিয়েছে, 6টি হাসপাতাল ও বহু ক্লিনিকে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের ফলে জানা যাচ্ছে, বোম্বেতে রোজ অন্তত 10 জন গর্ভবতী নারী ঐ পরীক্ষা করায়। Women's World পত্রিকা (সেপ্টেম্বর' 86) জানিয়েছিল, মূল বোম্বে নগরেই অন্তত 15টি এ ধরনের প্রাইভেট ক্লিনিক আছে।

বোম্বের সরকারী জে. জে. হাসপাতালে 1976-এ জবরদস্তি 'নাস-বন্দী'র জরুরী জন্মনিয়ন্ত্রণের রাজত্বে প্রাক-প্রসব এই লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা করানো হত। 1977-এ জনতা পার্টির রাজত্বে চমকদার নেতা রাজনারায়ণ ঐ পরীক্ষার বিরুদ্ধে ও জে. জে. হাসপাতালের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার চালান। এতে বেশ কিছুদিন অ্যামনিওসেন্টেসিস বন্ধ রইল ঐখানে। কিন্তু, কিছুদিন পর থেকেই কিছুটা প্রকাশ্যেই কর্তৃপক্ষ খদ্দেরদের নিকটবর্তী হরকিষেণ দাস হাসপাতালে ঐ পরীক্ষা করিয়ে জে জে. হাসপাতালে এসে গর্ভপাত করাতে পরামর্শ দিতে শুরু করল। এমনকি, প্রথম দিকে স্ত্রী-ভ্রূণর গর্ভপাতের জন্য বেশ কিছু সুবিধাও দেওয়া হত।[7]

হরকিষেণ দাস সরকারী হাসপাতাল না হলেও, একটি এটি জেনারেল হাসপাতাল। হরকিষেণ দাস কর্তৃপক্ষ একটি প্রচারপত্র বিলি করেছিল, যাতে ঐ পরীক্ষাকে স্পষ্টতই "humane & beneficial" বলা হয়েছে। ভিড় সামলাতে এক মাস আগে থেকেও অগ্রিম বুকিং চলে। এখানে গর্ভপাত হয় না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অ্যামনিওসেন্টেসিস করার সময়ই খদ্দেরদের প্ররোচিত করে গর্ভপাতের পর ভ্রূণকে হাসপাতালে জমা দিয়ে যেতে, যাতে আরো গভীরতর জেনেটিক গবেষণা করা যায়।

পার্ল সেন্টারে 80 টাকাতেই ঐ পরীক্ষা করানো হচ্ছিল। মাসে প্রায় 60টি পরীক্ষা করানো হয় এখানে। হরকিষেণ দাসের মত পার্ল সেন্টারও দাবী করে যে, পরীক্ষার ফলাফল 97%ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যথাযথ (accurate)। কিন্তু, এ তথ্যর প্রামাণিকতা কিছু নেই। কারণ, এখানে পরীক্ষার ভুল-ত্রুটি কিছুই পেশেন্টকে জানানোই হয় না। এখানকার ডাক্তার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 1% ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে ভ্রূণের বেশ ক্ষতি হয়।[3]

কে. ই. এম. হাসপাতালেও ভ্রূণের amniotic fluid বার করে আনা হয় এবং তারপর তা হরকিষেণ দাস হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এই হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট এক ডাক্তার আলাদা একটি নিজস্ব ক্লিনিক খুলেছেন, যেখানে লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা হয়।[3]

বিতর্ক, প্রতিবাদ, বিরোধিতাও হয়েছে—

1982-র জুলাইতে অমৃতসরে ডাঃ এস. ভাণ্ডারি যখন একটি পুং-ভ্রূণকে স্ত্রী-ভ্রূণ বলে নির্ণীত করে গর্ভপাত করালেন এবং এ খবর বাইরে ছড়িয়ে গেল, তখন সারা দেশেই সংবাদপত্রগুলো এ নিয়ে বিতর্ক তুলেছিল। বিশেষত, EPW, India Today, Eve's Weekly, Sunday প্রভৃতি পত্রিকায় তীব্র বিতর্ক ওঠায় এবং বোম্বে, দিল্লীর অধিকাংশ নারী সংগঠন অ্যামনিওসেন্টেসিসের বিরোধিতা করায়, দেশ জুড়েই বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী মহলে এ প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। অ্যামনিওসেন্টেসিস কেন লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে, এর পিছনের সামাজিক মতাদর্শ কী, ইত্যাদি

নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুধুমাত্র কিছু ফেমিনিস্ট সংগঠনই করতে শুরু করল। "Committee for Responsible Genetics" (এটি বায়োটেকনোলজি বিষয়ক একটি জাতীয় সংস্থা)-এর উপসমিতি "Women and Reproductive Technology" বা WRT গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরেই বায়োটেকনোলজির অপব্যবহার বিশেষত এর নারী-অবদমনের প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা, আলোচনা করছেন, প্রচারও করছেন। 1983 থেকেই বোম্বে এবং কিছুটা দিল্লীতেও কিছু নারী সংগঠন শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোয় সরেজমিন তদন্ত, বিস্তৃত সামাজিক সমীক্ষা শুরু করল। সংগঠনগুলো এক জায়গায় মিলিত হয়ে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করল। 1985তে "Forum against sex determination and sex pre-selection techniques" (104, বি-ব্লক, সানরাইজ অ্যাপার্টমেণ্টস, নেহেরু রোড, সান্টাক্রুজ ইস্ট, বোম্বে-400005) গঠিত হল। 1986-তে ফোরাম 28 মিনিটের একটি হিন্দী ভিডিও ফিল্ম করেছে, যাতে অ্যামনিওসেণ্টেসিসের সবরকম সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা, ত্রুটি এবং সামাজিক নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঐ বছরেরই আগস্টে বোম্বেতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষার তীব্র বিরোধিতা করে বহু ব্যক্তি ও ফেমিনিস্ট গ্রুপ মিছিল, পোস্টার-প্রদর্শনী, দেয়াল-পোস্টারিং, পথ নাটিকা সংগঠিত করেছে। দিল্লীতেও 'মানুষী' এবং অন্যান্য সংগঠন মিলে সেমিনার, পোস্টারিং ইত্যাদি করেছে। অন্যান্য বড় শহরেও নারী সংগঠন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংস্থাগুলো একই রকম প্রতিবাদ সংগঠিত করেছেন।[1,2]

কিন্তু, সরকারের ঘুম ভাঙে স্বাভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে কয়েক বছর বাদে। সরকারী হাসপাতাল, ডাক্তার, আমলা, বিজ্ঞানীরা যা জানান, আমাদের অন্ধ-ধৃতরাষ্ট্র তার বেশি জানার চেষ্টা করেন না সাধারণত। বিশেষত স্ত্রী-ভ্রূণ হত্যার মত নিছক 'সামাজিক ঘটনা'র প্রশ্নে মন্ত্রী, ক্যাবিনেট বা লোকসভা-রাজ্যসভা তো অ্যাজেণ্ডা আনতে পারেন না। লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা যখন হাজারে হাজারে হতে লাগল এবং প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের একাংশই যখন স্বাস্থ্য ও পরিবার মন্ত্রককে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে পরামর্শ দিলেন, তখন ঐ মন্ত্রক 1986তে বিতর্কিত বিষয়টি অনুসন্ধানের একটি সরকারী কমিটি গঠন করলেন। ঐ কমিটি এক মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে প্রাইভেট ক্লিনিক ও নার্সিং হোমে অ্যামনিওসেণ্টেসিস বন্ধের দাবী জানিয়েছে। ঐ পরীক্ষার জন্য কোন রকম বিজ্ঞাপন দেওয়াও নিষিদ্ধ করার দাবী করা হয়েছে।[5] কিন্তু, বহু সংগঠনই ঐ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার দাবী জানালেও, সরকার এখনও অব্দি কার্যত কিছু করেননি। এমনকি, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনও চলছে। প্রমাণিত ক্ষেত্রেও, পরীক্ষা-করিয়ে ডাক্তাররা সরকারী তরফে কোন ভর্ৎসনা অব্দি শোনেননি এখনও।

'Women's Centre' বোম্বেতে 1984-র ডিসেম্বরে দু'দিনব্যাপী এক আলোচনাচক্রে দীর্ঘ বিতর্কের পর প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে, লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অ্যামনিওসেণ্টেসিস করানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।[3] মার্চ '85তে 'From the lawyers' collective' পত্রিকায় Anand Grover অ্যামনিওসেণ্টেসিসের আইনী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় স্পষ্টই জানান যে, Medical Termination of Pregnancy Act এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে অ্যামনিওসেণ্টেসিসের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা ও তৎপরবর্তী গর্ভপাত একটি criminal offence.

উপসংহার : কন্যাসংহারের বদলে—

1987-র ডিসেম্বরে জয়পুরে ভারতীয় স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ফেডারেশনের 31তম সর্বভারতীয় কংগ্রেসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, যেসব চিকিৎসক অন্তঃসত্ত্বার গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ণয় পরীক্ষা করিয়ে থাকেন, তাঁদের সম্পূর্ণ বয়কট করবেন ফেডারেশন। ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন, লিঙ্গনির্ণয় পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার। আগামী অধিবেশনেই না কি সরকার এ রকম একটি বিল আনবেন।

ধরা যাক, সরকার সত্যিই লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলেন। হয়তো, আরো র‍্যাডিকাল হয়ে, সরকার এরকম আইন করলেন যে, কোন ডাক্তার এ ধরনের পরীক্ষার সাথে কোন সম্পর্ক রাখলে, তার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অধিকারও সরকারের রইল। এ ধরনের প্রগতিশীল আইন পাশ করার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন লবি হয়তো বিরোধিতাও করতে পারেন। কিন্তু ধরা যাক, সে সব অতিক্রম করেই আইন পাশ হল। কিন্তু ঐ আইনগুলো ঠিক ঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তার ভিজিলেন্স করবে কারা? এতদিনকার অপদার্থ, অকর্মণ্য সংস্থা যথা গোয়েন্দাসংস্থারা, থানা, প্রশাসন এবং চিকিৎসক সংস্থারাই ভিজিলেন্স করবেন? তাছাড়া, এতবড় দেশে প্রতিটি শহরে, হাসপাতালে, নার্সিংহোমে, ক্লিনিকে নজরদারি রাখা সম্ভব? এ দেশে তো, প্রতিটি অসুখের ক্ষেত্রেই, হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের পাশাপাশি হাতুড়ে ডাক্তার, বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর চিকিৎসালয়ের রমরমা। গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণের ক্ষেত্রেও যা হয়েছে, তা তো ইতিমধ্যেই ছোট শহরের ছোট ক্লিনিকগুলোয় অ্যামনিওসেণ্টেসিসের ক্ষেত্রেও হতে শুরু করেছে। নিষিদ্ধকরণের ফলে, গোপনে আরো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঐ পরীক্ষা হবে। আর এটা, হবেই। ফলে, ভ্রূণ ও গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আরো বেশি সম্ভাবনা। তবে, পরীক্ষা-করিয়ে ডাক্তারদের বয়কট ও রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আইন হলে, লিঙ্গনির্ণয় পরীক্ষা করানোর পথ অনেকটাই বন্ধ হবার সম্ভাবনা। কিন্তু, এখানেও একই প্রশ্ন, সেই আইন কার্যকর করার সরকারী ব্যবস্থা কতটুকু আছে? বা, কতটুকু থাকা সম্ভব? এক্ষেত্রে ডাক্তারদের পক্ষে আইনভঙ্গ করাটা খুব কঠিন নয়। কারণ, অ্যামনিওসেণ্টেসিস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার দাবী এখনও অব্দি প্রায় কোন মহলই তোলেননি। ফলত, সরকারও অ্যামনিওসেণ্টেসিস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করবেন না। আর জেনেটিক ত্রুটি নির্ণয়ের নামে ঐ পরীক্ষায় লিঙ্গনির্ণয়ের গোপন সুযোগও থেকে যাবেই। তাহলে তো, লিঙ্গনির্ণয় পরীক্ষা সম্পূর্ণ বন্ধের উদ্দেশ্যে অ্যামনিওসেণ্টেসিস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত!

তবু আশা করা যায়। স্বপ্ন দেখা যায়। এমন একটি মানবিক দেশ ও কালের যেখানে পণপ্রথা, বধূহত্যা, বৌ-পেটানো নেই, যেখানে কন্যা জন্মালে পাড়া প্রতিবেশী মিষ্টিমুখ করছেন, যেখানে ছেলে ও মেয়ের আর্থিক স্বাধীনতা চূড়ান্ত, যেখানে দেশের অর্থনীতির সেরকম পরিবর্তন ঘটেছে, যেখানে বাবা-মারা তাদের জীবন, শরীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে পারেন, যেখানে ডাক্তাররা অর্থের প্রয়োজনে চিকিৎসা করেন না, যেখানে আইন জনস্বার্থেই রচিত, যেখানে আইন প্রয়োগের সামাজিক ব্যবস্থা আছে—এবং এ রকম স্বপ্নের অবস্থাতেই ভ্রূণের লিঙ্গনির্ণয় পরীক্ষা বন্ধ হতে পারে। □

[নিজের ব্যক্তিক মতামতই জানানো সম্ভব। তাই জানালাম। সত্যি বলতে কি, অ্যামনিওসেন্টেসিসের জেনেটিক পরীক্ষার বিরোধী নই আমি। লিঙ্গনির্ণয় পরীক্ষার বিরোধী আমি। এবং এক্ষেত্রেও অ্যামনিও-সেন্টেসিসের টেকনিক্যাল দিক নিয়ে চিন্তিত নই। এর সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহই এ প্রবন্ধের উপজীব্য।]

সংযোজন

বিভিন্ন দেশে নারীর সংখ্যা, প্রতি হাজার পুরুষে

সোভিয়েত রাশিয়া	1160	চিলি	1026
পূর্ব জার্মানী	1150	সুইডেন	1019
পোল্যাণ্ড	1122	কানাডা	1002
পশ্চিম জার্মানী	1096	কেনিয়া	997
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	1054	অস্ট্রেলিয়া	991
ব্রিটেন	1053	উগাণ্ডা	983
ফ্রান্স	1044	বাংলাদেশ	962
জাপান	1030	ইরান	937
ভারত	925	পাকিস্তান	886

[সূত্র : U. N. Demographic Yearbook, 1976, New York]

তথ্যসূত্র :

1. Women's World, September, 1986.
2. The Scarcer Half, January, 1986, Counterfact No. 9.
3. Ammu Abraham and Sonal—'Sex Determination Tests', Women's Centre, Bombay, 1985.
4. Ravindra R. P., 'Refined Techniques of Femicide', Manushi, May-June, 1986.
5. Health For the Millions, February-April, 1987.
6. Socialist Health Review, September, 1984.
7. 'A World without women ?' by Chachhi, A. and Sathyamala, C. (Published by Voluntary Health Association of India).
8. 'Results of a Danish study' by J. Philip and J. Barg (British Medical Journal, No. 2, 1978).
9. 'Little Girls and Death In India'—Pranab Bardhan, EPW, September 4, 1981.
10. Population Reports.
11. 'Implications of Declining Sex Ratio in India's Population'—Ashok Mitra, ICSSR, 1979.
12. 'Misadventures in Amniocentesis'—Leela Dube, EPW., February, 1983.
13. U. N. Demographic Yearbook, 1976, New York.
14. Alice Clark, 1983 (Women's World, March '85-এ উদ্ধৃত).
15. 'Sex Determination Tests : A Technology which will Eliminate Women'—Amrita Chachhi and Sathyamala C. (Medico Friend's Circle Bulletin, November, 1981).
16. M. P. Lata at Seminar organised by SNDT University, 8 March, 1984.
17. আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদকীয়, 29শে ডিসেম্বর, 1987.

॥ গণবিজ্ঞান ॥ মহারাষ্ট্র লোকবিজ্ঞান সংগঠন : 'লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার'

[গণবিজ্ঞান বা জনবিজ্ঞান—কথাটি আজকাল বেশ শোনা যাচ্ছে। কি এর তাৎপর্য, কেমন হওয়া উচিত এর স্বরূপ, ইত্যাদি নিয়ে চারদিকে আলোচনা বিতর্কও চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে গণবিজ্ঞানের সম্পর্কই বা কি হওয়া উচিত বা সম্ভব তা এখনও স্পষ্ট নয় ; স্পষ্ট নয়, কি ভাবে কতটা গণবিজ্ঞান সম্পর্কিত হতে পারে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে, রাজনীতির সঙ্গে, রাজনৈতিক দল বা সরকারের সঙ্গে।

এতসব অস্পষ্টতা সত্ত্বেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এবং হ্যাঁ, সারা ভারতেই, ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষ এগিয়ে আসছেন, একক বা দলবদ্ধভাবে গণবিজ্ঞানের কাজে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, 1977 সালে ত্রিবান্দ্রমে "কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ" আয়োজিত "সর্বভারতীয় গণবিজ্ঞান সম্মেলন" থেকেই গণবিজ্ঞান কথাটি এবং "জনগণের জন্য বিজ্ঞান" শ্লোগানটি ভারতে ব্যাপ্তি লাভ করেছে!

পশ্চিমবঙ্গে তার কিছু আগে থাকতেই কিছু কিছু গোষ্ঠী "মানুষের জন্য বিজ্ঞানের" লক্ষ্যে কাজকর্ম শুরু করেছিল। আজ তেমন উদ্দেশ্যবাহী সংস্থা, ক্লাব বা গোষ্ঠীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে যোগাযোগ, বোঝাপড়া এখনও অসম্পূর্ণ। বার কয়েকের চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তা সত্ত্বেও এইসব স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি গণবিজ্ঞানের লক্ষ্যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম করে চলেছেন। সম্প্রতি প্রত্যক্ষ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গণবিজ্ঞানের কাজে নেমেছেন আরও একটি মঞ্চ। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারও আগের চেয়ে অনেক বেশি বেশি গণবিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন—এটা নিশ্চয়ই আশার ও আনন্দের কথা।

গণবিজ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা স্পষ্ট না হ'লেও এ সম্পর্কিত কাজকর্ম অনুধাবন করার জন্যও ন্যূনতম কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। দু-একটি কথা বলা যাক : গণবিজ্ঞানের দুটি দিক—একটি ব্যবহারগত বা প্রযুক্তির দিক। বিজ্ঞানের সুফল সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন—মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হোক এই আশা। আর দ্বিতীয়টিকে সাংস্কৃতিক দিক বলা যায়। বিজ্ঞানের সুফল ছড়িয়ে দিতে গেলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মানসিক ও পারিবেশিক জমিও তৈরি করা প্রয়োজন। শেষ বিচারে বোধহয় বলা যায়, গণবিজ্ঞান হ'ল বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে, ধনতান্ত্রিক বিকৃতির বিরুদ্ধে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে বিকল্প সন্ধান এবং তা গণআন্দোলন ছাড়া সম্ভব নয়। এ কথাগুলি শুনতে সহজ হলেও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর জটিলতা বহু। কারণ "বিজ্ঞান" বলতে সচরাচর যা বোঝানো হয় তা সর্বদা সকলের জন্য সুফলদায়ী নয়,—বিজ্ঞানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ব্যক্তি সকলে নয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। আর সবচেয়ে বড় কথা আজকের বিজ্ঞান—গণতান্ত্রিক দেশে—প্রধানত ক্ষমতাসীন দল, গোষ্ঠী, তথা শ্রেণীর সেবাদাস। এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশের বেলাতেও বিজ্ঞান সর্বদা গণমুখী ও সুফলদায়ী এমন কথা বলা শক্ত।

সে যাহোক, আপাতত, আমরা প্রাথমিক কিছু ধারণার জন্য "গণবিজ্ঞান কি ও কেন" শীর্ষক পুস্তিকাটির (সম্পা : মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, প্রকাশক : অমূল্য মণ্ডল, B6/119 কল্যাণী, নদীয়া ; পরিচিতি : বি ও-বি, মার্চ-এপ্রিল 1982) উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হব। আলোচনা-বিতর্ক চলতে থাকুক। ইত্যবসরে আসুন আমরা গণবিজ্ঞান নিয়ে কারা কি ভাবছেন, করছেন, তার কিছু কিছু পরিচয় নিতে থাকি একে একে। এবারের সংখ্যায় মহারাষ্ট্রের "লোকবিজ্ঞান সংগঠনে"র লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার 1988-র পরিচয় পেশ করা হ'ল। (এর আগে বি-ও-বি মার্চ এপ্রিল 1984-তে এই সংগঠনেরই "বোম্বাই বিজ্ঞান যাত্রা" আলোচিত হয়েছে।)—লেঃ

এ বছর জানুয়ারিতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্লাটিনাম জুবিলী অধিবেশন বসেছিল পুণেতে। আর এই বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের বিশেষ স্মরণিকা হিসেবে মহারাষ্ট্র লোকবিজ্ঞান সংগঠনের পুণে শাখা প্রকাশ করেছে "লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার, 1988"। এই বিশেষ ইংরেজি ক্যালেণ্ডারটি তৈরি হয়েছে তাদেরই প্রকাশিত মারাঠী ক্যালেণ্ডারের আদলে।

এই ক্যালেণ্ডার প্রকাশের উদ্দেশ্য, সংগঠনের ভাষায়—"বিজ্ঞানকে আমাদের বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ করে তুলতে হলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিজ্ঞান-দিবস পালন করতে হবে।"

এমনিতে সাদামাটা ক্যালেণ্ডার। প্রতি পাতার সামনে বাঁদিকে দুজন ক'রে বিজ্ঞানীর ছবি, ডানদিকে দু'মাসের বার-তারিখ, নীচে বিশেষভাবে চিহ্নিত ঐ দু'মাসের বিশেষ কিছু তারিখ, যেগুলি বিখ্যাত কোনো বিজ্ঞানীর মৃত্যুদিন। আর ক্যালেণ্ডারের পেছনের পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে কিন্তু প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয়েছে বিজ্ঞানের আদি-উৎস, প্রাচীন ভারতীয়, চৈনিক, আরবীয় ও গ্রীক বিজ্ঞানের পরিচয়। 13 জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর (কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, হার্ভে, নিউটন, ডারউইন, ফ্যারাডে, মাদাম কুরী, পাস্তুর, আইনষ্টাইন, পাভলভ, রমন, জগদীশ বসু ও মেঘনাদ সাহা) জীবনী ও কাজ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে ; তাছাড়াও আরও 34 জন বিজ্ঞানীর বিষয়েও দু-এক লাইন বলা হয়েছে। উল্লিখিত এই 47 জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু তারিখগুলিই শুধু ক্যালেণ্ডারে চিহ্নিত করা হয়েছে—যদিও পেছনের পৃষ্ঠায় জন্মদিনও উল্লেখিত হয়েছে। লোকবিজ্ঞান সংগঠনের আশা, স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান ক্লাব বা অন্যান্য সংগঠন প্রতি মাসে অন্তত একটি দিন কোন বিজ্ঞানী ও তাঁর অবদান আলোচনায় কাটাতে পারেন। কিভাবে এসব দিনগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করা যেতে পারে আগে থেকে পোস্টার ছবি বা স্লাইড তৈরি করে—কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

হিরোসিমা দিবস, পরিবেশ দিবস ও ভূপাল দিবস অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডারে। ঐ দিনগুলির পটভূমি ও তাৎপর্যও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

এক কথায় বলা যায়, লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডারটি নিছক ক্যালেণ্ডার মাত্র নয়, সেই সঙ্গে এটি একটি বই, এবং বহন করছে গণবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা তথ্য দিশা।

তবে দামটা একটু বেশিই—দশ টাকা। সহজলভ্যও নয়। উৎসাহীরা সরাসরি পুণেতে যোগাযোগ করতে পারেন (লোকবিজ্ঞান সংগঠন পুণে, 759/97D শান্তিভুবন, প্রভাত রোড লেন, নং—2, ডেকান জিমখানা, পুণে—411004)। লোকবিজ্ঞান সংগঠনের আশা, অন্যান্য রাজ্যের গণবিজ্ঞান কর্মীরা তাঁদের অনুসরণে স্থানীয় ভাষায় গণবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করতে এগিয়ে আসবেন। □

রবীন মজুমদার

বিজ্ঞান দিবস '৪৪

গত 28 শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বেশ ধূমধাম করে সরকারী অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গে "জাতীয় বিজ্ঞান দিবস" পালিত হল। পশ্চিমবঙ্গ নয় কলকাতা বলাই বরং যুক্তিযুক্ত কারণ পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র 28শে ফেব্রুয়ারী পালনের এ ধরনের সরকারী উদ্যোগের খবর আপাতত আমাদের কাছে নেই। এখানে উল্লেখ্য, 1927 সালের ঐ দিনটিতেই নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেংকট রমন 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার করেন। তাঁকে স্মরণে রেখেই 1987 সালে প্রথম 28 ফেব্রুয়ারীকে "জাতীয় বিজ্ঞান দিবস" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

কেমন কাটল দিনটি

কলকাতার পাঁচটি অঞ্চল থেকে পাঁচটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের মিছিল দিয়ে দিনটির শুরু। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল, হাওড়ার কয়েকটি বিজ্ঞান ক্লাব, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান সংস্থা ও যাদবপুরের কয়েকটি বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে যথাক্রমে গোয়াবাগান, বেহালা, হাওড়া স্টেশন, বেলেঘাটা ও দেশপ্রিয় পার্ক থেকে পাঁচটি মিছিল সকাল 8-8.30-টা নাগাদ যাত্রা শুরু করে দশটা-সারে দশটা নাগাদ বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের বিপরীতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড সংলগ্ন মাঠে পৌছায়। সবশুদ্ধ হাজার দুয়েক ছেলেমেয়ে মাথায় সাদা টুপি, বুকে শান্তির দূত পায়রা আঁকা নীলসাদা ব্যাজ এঁটে, হাতে ব্যানার, ফেস্টুন-পোষ্টার নিয়ে যখন মাঠে এসে হাজির হ'ল তখন মাইকে চলছিল গণসঙ্গীত, চলছিল যৌবনকে চাঙ্গা করার কবিতা। সাদা টুপিতে লাল দিয়ে লেখা "বিজ্ঞান আমাদের কল্যাণমন্ত্র" আর ছিল ইংরাজী-বাংলায় লেখা রংবেরঙের পোষ্টার। বক্তব্যগুলো মোটামুটি এরকম : বিজ্ঞান জাগায় অনুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞান কুসংস্কারকে ধ্বংস করে, বিজ্ঞান মানেই জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞান অন্ধকারকে ধ্বংস করে! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ বোস, গ্যালিলিও সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানীর ছবি আঁকা পোষ্টারও ছিল বেশ কয়েকটা। মঞ্চেও অভিনীত হল ব্রেখ্‌টের লেখা শিক্ষার উপর একটি নাটিকা। "অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক"-এ প্রদর্শিত হল কয়েকটি যাদু—পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী পরিষদ ও যাদবপুরের একটি ক্লাব এতে অংশ নিল। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন কয়েকজন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তি।

মাঠে যখন এসব চলছিল ঠিক তখন গুরুসদয় দত্ত রোডে রঙবেরঙের পতাকায় সজ্জিত ঝক্‌ঝকে বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়ামে আরম্ভ হয়েছিল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যার মধ্যে ছিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কুইজ, কবিতা, আলোচনা, নাটক প্রতিযোগিতা—সারাদিন ধরে। আর সারা রাত চলল আকাশ পর্যবেক্ষণ, ভিডিওতে আকাশ, পরিবেশ, বণ্যপ্রাণীর উপর চলচ্চিত্র। গ্যালিলিও, কম্পিউটারের উপর দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটকও অনুষ্ঠিত হল। এক কথায় সারা দিন-রাত ধরেই কেবল বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

"বিজ্ঞান ও সভ্যতা," "সুস্থ ভাবে বাঁচতে হলে," "মৌলবাদ বনাম বিজ্ঞান" নামের তিনটি পুস্তিকা, ব্যাজ, টিফিন, পোষ্টার, লিফ্‌লেট, ব্যানার সহ উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলোর জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ থেকে পাওয়া গেছে একলাখ চল্লিশ হাজার টাকা। এই টাকা প্রধানত বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ মারফত খরচ হ'ল। 28শে ফেব্রুয়ারীর এই অনুষ্ঠানটির দিকে চোখ রাখলে কতগুলো কথা মনে আসতেই পারে। যেমন—

(1) অনুষ্ঠানটি যে শুধু কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল তাই নয়, তাও আবার বিশেষ কিছু নামীদামী স্কুল ক্লাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(2) চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সরকারী আধাসরকারী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বক্তৃতার প্রাধান্য ছিল।

(3) দু-একটি বিজ্ঞান ক্লাবের নাটক ও ম্যাজিক ছাড়া অন্যান্য কোন অনুষ্ঠানেই বৈচিত্র্য বিশেষ চোখে পড়ে নি, বেশীর ভাগই ছিল পুঁথিকেন্দ্রিক, Follow up-এর প্রচেষ্টাবিহীন এসব অনুষ্ঠান পরবর্ত্তীকালে কোন গভীর ছায়া ফেলে বলে মনে হয় না। তবু বরঞ্চ নাটক ম্যাজিকগুলো কিছুটা ভাল লাগে।

(4) এই 28শে ফেব্রুয়ারীকে ঘিরে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন কিছু পার্টি কর্মীর হঠাৎ ব্যস্ততা চোখে পড়ার মত।

(5) অনুষ্ঠানটি ছিল অনেকটা ওপর থেকে সংগঠিত প্রোগ্রামের মতো—স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পরিবেশ ঠিক তৈরী হয় নি। সরকারী বদান্যতায় আয়োজিত এসব প্রোগ্রামের কার্যকারিতা কতখানি?

আজকের দিনের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পরিমণ্ডলে উঁচুতলার দাক্ষিণ্য ও সহযোগিতায় 'বিজ্ঞান আন্দোলন' বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে, যা আন্দোলনের ব্যাপক গণভিত্তি অর্জনের পক্ষে সহায়ক নয়।

আঠাশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানাচ্ছি—সংশ্লিষ্ট সকলকে এ দিকটি সম্পর্কে ভাবতে অনুরোধ ক'রে।

—শান্তনু ত্রিবেদী

R. N. 34929/79
YEAR 11 NUMBER 5

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
EC 106, Salt Lake, Cal-64
Mar-Apr, 1988

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

গত এক বছরে কি কি ছিল

মার্চ-এপ্রিল 1987

□ □ আদিবাসী চিকিৎসা : একটি বিকল্প ব্যবস্থা ॥ সুনীল মাহাতো □ প্রসঙ্গ বালিয়াপাল : পটভূমি—ভারতের সামরিক ব্যবস্থা ॥ শুভেন্দু দাশগুপ্ত □ পরমাণু তুমি কার—বিজ্ঞানের না ব্যবসার ॥ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার □ কাঁথি মহকুমার চাষীদের দুর্ভোগ : কার দোষে ॥ শুভব্রত পাণ্ডা □ টেস্ট টিউব বেবী : কলকাতা '78 ও '86 ॥ সুব্রত ভট্টাচার্য □ পরমাণু শক্তি আইনের রাজনীতি ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় □ □

মে-আগস্ট 1987

□ □ শ্রমিক উদ্যোগে শহীদ হাসপাতাল ॥ শান্তনু ত্রিবেদী □ পরমাণু সাম্রাজ্যের অন্দর মহল ॥ বিশেষ প্রতিবেদক □ অর্দ্ধেক আকাশের নক্ষত্রেরা ॥ স্বরূপ গুপ্ত □

□ □ **ক্রোড়পত্র : বি-ও-বি'র দশ বছর** □ আগামী দশ বছরের জন্য প্রস্তুতির পক্ষে ॥ দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী □ বি-ও-বি'র এক দশক : "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ" ॥ সুব্রত ভট্টাচার্য □ বি-ও-বি'র বন্ধুদের প্রতি ॥ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় □ গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ॥ দিলীপ হোতা □ দশ বছরের সূচী : 'নিউক্লিয়ার বিতর্ক' ॥ সংকলন □ □

□ জপুরে রাসায়নিক দূষণ ॥ বরেন ভট্টাচার্য ॥ বি-ও-বি'র পক্ষে তাপস ঘোষ □ □

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1987

□ □ সমর সেন : প্রয়াণ, স্মরণ ও শ্রদ্ধা ॥ স: মা:, বি-ও-বি □ 'আদিবাসী চিকিৎসা : একটি বিকল্প ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে ॥ আশিস কুণ্ডু □ কমপিউটার : কিছু কথা কিছু প্রশ্ন ॥ সুরঞ্জন কর □ পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প : প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় □

□ □ **ক্রোড়পত্র : বি-ও-বি'র দশ বছর** □ জীবনী আলোচনায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী ॥ রবীন মজুমদার □ মনুষ্যকৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ॥ কুমারেশ মিত্র □ বি-ও-বি'তে 'মন' ॥ অমল সোম □ পরিবেশ দূষণ আলোচনায় বি-ও-বি ॥ পার্থ সেন □ □

□ আরো বিকলাঙ্গ শিশু অথবা আর হাই ডোজ ই-পি নয় ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী □ মন্দির বাজার : সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ॥ দীপক □ জপুরে ক্রোমিয়াম দূষণ : সর্ষের মধ্যে ভূত ॥ সুরশ্রী চৌধুরী □ □

জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী 1988

□ □ সবুজ সম্ভাবনা ॥ সুমিত বিশ্বাস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর □ জ্ঞান : অজ্ঞান, বিজ্ঞান ॥ স্বরূপ গুপ্ত □ গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও মহিলাদের সংগ্রাম ॥ (মূল রচনা) পদ্মা প্রকাশ □ মৌল গবেষণা : প্রয়োজন না প্রসাধন ॥ সুব্রত ভট্টাচার্য □ সাবধান ! ওপরওয়ালা নজর রাখছে ॥ (সংগ্রহ) সুরশ্রী চৌধুরী □ মাটি খাওয়া রোগ ॥ স্মরজিৎ জানা □ 'অখাদ্য খাওয়া রোগ'—পশুতে ॥ সুকুমার সাহা □

□ □ **ক্রোড়পত্র : বি-ও-বি'র দশ বছর** □ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী □ □

□ নিকারাগুয়ার ডায়েরী ॥ অনিল গুপ্তা □ □

এ ছাড়া বই-পরিচিতি, সমাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গে মন্তব্য।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং সেন্টার, 18B ভুবন ধর লেন, কলি-12 থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত